শ্রীহরিদাস

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

রত্না প্রকাশনী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০এ, রামমোহন সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশিকা :
রত্না সেন
২০এ, রামমোহন সাহা লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখী পূর্ণিমা। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ : মাণিক সরকার

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীপ্রকাশনী
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : ১·৫০

মুদ্রক :
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭/১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতৃদেব
কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে গভীর তৃপ্তি ও পরম
আনন্দ লাভ করছি।

গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে লোকসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভূমিকা

কায়া আর ছায়া।

এ দুই-এর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

শ্রীচৈতন্য কায়া, আর

শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভক্তরা তাঁর ছায়া।

কায়াকে বাদ দিয়ে ছায়ার কথা বলা সম্ভব নয়

শ্রীহরিদাসের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে

শ্রীচৈতন্যের কথা

স্বতঃই একটু বেশী এসে গিয়েছে।

সংকেত নির্দেশ—

চৈ. চ.—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

চৈ. ম.—শ্রীচৈতন্য মঙ্গল

চৈ. ভা.—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

অ. প্র.—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

গো. পুঁ.—গোসাঁই গোরাচাঁদের পুঁথি

'তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ বলে শতমুখ হঞা॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার॥

*　　*　　*　　*

সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র॥'

(চৈ. চ.)

॥ এক ॥

অন্ধকার রাত্রি। রাত্রি যত বেশী আঁধার তত ঘন। উষার ঠিক আগে রাত্রির আঁধার সবচেয়েই নিবিড়। তারপরে ধীরে ধীরে আঁধার কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পুব আকাশও একটু একটু করে ফরসা হতে শুরু করে। কিছু পরে সূর্যদেব পুব আকাশে দেখা দেন। তখন শুধু পুব আকাশই নয়, সারা পূর্ব জগত আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে।

যাঁরা মহাপুরুষ—তাঁদের আবির্ভাব কতকটা সূর্যের উদয়ের মতো। দেশে যখন নানারকম গ্লানি, অনাচার, অবিচার, অজ্ঞানতা, নীচতা, গোঁড়ামি—এই সব পুঞ্জীভূত হয়ে জমে ওঠে, তখনই বুঝতে হবে মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো বলে। রাতের আঁধার ঘনতম হলেই যেমন বোঝা যায় উষার আবির্ভাবের আর দেরি নেই।

রথের সামনেই সারথির আসন। সূর্যদেবের সারথি অরুণ। অরুণোদয় তাই দেখি আমরা আগে। পরে দেখি সূর্যের প্রকাশ। ঠিক এমনিধারা মহাপুরুষের আবির্ভাবের আগে, তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্যে, তাঁর পথ পরিষ্কার করে রাখবার জন্যে, ঐ মহাপুরুষের সহচর, তাঁরাও এক একজন মহামানব, ঐ দেশেই জন্ম নেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, তাঁরা ঘোষণা করেন, তিনি এলেন বলে—আর বিলম্ব নেই। তারপর সত্যি সত্যি একদিন দশদিক উজ্জ্বল করে তাঁর আবির্ভাব হয়। ফলে আঁধার দূর হয়—অজ্ঞানতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি গ্লানি লোপ পায়।

আজ হতে প্রায় ছশো বছর আগে আমাদের বাঙলা দেশের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। সমাজে নানা গ্লানি জড়ো হয়েছিল। পাঁচশো বছরের ঠিক আগের অবস্থা, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অবস্থা হয়ে পড়লো—যাকে বলে একেবারে সঙ্গীন। ঠিক ঘনতম রাত্রির আঁধারের মতোই।

দেশের এই চরম দুর্দিনে এক-একজন করে দিকপাল দেখা দিতে লাগলেন। জন্ম নিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। আবির্ভূত হলেন শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীহরিদাসকে দেখা গেল। এই রকম আরও অনেকে বাঙলার আকাশে উদিত হলেন। তারপরে একদিন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করে, বাঙলা দেশ আলোকিত করে, সারা ভারত উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরম আদরের ধন, নয়নানন্দনন্দন। বাঙালীর চরিত্রে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, যা কিছু পবিত্র—সেই সব নিয়েই বিধাতা তাঁকে বাঙলার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টির মতোই।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে শ্রীহরিদাসের জন্ম হয়েছিল। শ্রীহরিদাস ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর, ভক্ত। তিনি ছিলেন স্মরণমঙ্গল এক অসাধারণ পুরুষ।—

‘হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।’ (চৈ. চ.)

আমরা এখানে ‘পৃথিবীর শিরোমণি’ শ্রীহরিদাসের কাহিনী কীর্তন করি।

শ্রীহরিদাসকে লক্ষ্য করেই শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেছেন—

‘শতবর্ষে শতমুখে উহান্ মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥’ (চৈ. ভা.)

আর, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র॥' (চৈ. চ.)

আমাদের শাস্ত্রে একটি সুন্দর কথা আছে। যে কুলে এক মহাপুরুষের জন্ম হয় —সেই কুল পবিত্র হয়; যাঁর গর্ভে তিনি জন্ম নেন, সেই জননী কৃতার্থ হন; আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বসুন্ধরা তাঁর জন্মের ফলে পুণ্যবতী হন।

মহাপুরুষরা জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে। কোনও দেশের গণ্ডি দিয়ে তাঁদের সীমিত করা যায় না। তাঁদের কোন বিশেষ ধর্মের লোক বলাও সঙ্গত নয়। তাঁরা সারা পৃথিবীর সকল দেশের, সকল জাতির, সকল কালের সম্পদ। সারা জগতের লোক তাঁদের জয়গান করে।

কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের আপন-পর বোধ আছে। কোনও মহাপুরুষ আমাদের মাঝে জন্ম নিলে আমরা বলি, তিনি ছিলেন আমাদেরই লোক। তিনি আমাদের ঘরে, আমাদেরই মাঝে জন্মেছিলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা বিশেষভাবে গর্ব করি। আমাদের মাঝে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল বলে বহু ভাগ্য মানি।

শ্রীহরিদাস ছিলেন এমনি একজন মহামানব। তিনি আমাদেরই আপন-জন ছিলেন। আমাদেরই বাঙলা দেশে তিনি জন্মেছিলেন। জন্মেছিলেন্ খুব বেশী দিনের কথা নয়। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন এখানে-সেখানে এখনও রয়েছে। সে সব স্বচক্ষে দেখে আমরা ধন্য হই।

অনুমান করি, শ্রীহরিদাসের জন্ম হয় ১৩৭২ শকে বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাঘী পুর্ণিমার দিনে। আজ হতে পাঁচশো বছরের কিছু

আগে। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা সে সময় বুঢ়ন দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। এখনও সাতক্ষীরা শহরের আশে-পাশের এক বিস্তৃত অঞ্চলকে লোকে বুঢ়ন পরগণা বলে থাকে। এই বুঢ়ন পরগণায় কলাগাছি নামে এক প্রাচীন গ্রাম ছিল। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট্ট নদী সোনাই বয়ে যেত। কলাগাছি তখন এক বিশেষ নাম-করা জায়গা ছিল।

শ্রীহরিদাসের জন্ম এই কলাগাছি গ্রামে। তাঁর—

'উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর।' (চৈ. ম.—জয়ানন্দ)।

মনোহর চক্রবর্তী একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় পণ্ডিত। তাঁর একটি টোল ছিল। সেখানে তিনি ছেলেদের পড়াতেন।

হরিদাসের সবে যখন দুই বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা যান। লোকে বলে, তার মাও একই চিতায় সহমরণে দেহত্যাগ করেন।

এমনি করে একেবারে শিশুকালে হরিদাস তাঁর মা-বাবাকে হারালেন। আপন বলতে তাঁর আর কেউ রইলো না। তখন পাশের গাঁ হাকিমপুর থেকে হবিবুল্যা কাজী এসে অসহায় শিশুটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। আর, তাঁকে নিজের ছেলের মতোই লালন-পালন করতে থাকেন।

'সতী যবে উঠিল চিতায় নদীর উপকূলে।
জয়ধ্বনি করে সবে মহা উচ্চরোলে॥
হবিবুল্যা আসি ঘরে শিশু করি কোলে।
শান্ত করিবার ছল করি আপন ঘরে চলে॥' (গো. পুঁ.)

তিনি হরিদাসকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন।

'হবুল্যা লইয়া ঘরে পাইল মাণিক।
স্ত্রী-পুরুষে যত্ন করে প্রাণের অধিক ॥' (গো. পুঁ.)

কাজী সাহেবের চেষ্টায় আর আগ্রহে হরিদাস বাল্যে আরবী, ফারসী আর বাঙলা ভাষায় লেখাপড়া শেখেন। ছেলেবয়সে তিনি রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনতেন। হরিকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। খুব মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। প্রায়ই উদাসীর মত পথে-ঘাটে-মাঠে তিনি গান গেয়ে বেড়াতেন। সংসারে তাঁর মোটেই আসক্তি ছিল না। কাজী সাহেব হরিদাসকে ভালোবাসতেন। তিনি এসব লক্ষ্য করতেন।

হরিদাসের বয়স যখন আঠারো, তখন তাঁর বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারী করবার জন্যে কাজী সাহেব চেষ্টা করতে লাগলেন। হরিদাস তা টের পেলেন। একদিন গভীর রাতে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

'গভীর রজনী কেহ জানিতে না পায়।
হরিবোল হরিবোল বলি বাহিরায় ॥' (গো. পুঁ.)

তখন—

'শিরে করাঘাতে কান্দে হবুল্যার নারী।
মায়ার আশ্চর্য কার্য যাই বলিহারী ॥
কার পুত্র যায়, আর কান্দে কার মায়।
গোঁসাই গোরাচান্দে তাহা ভাবিয়া না পায় ॥' (গো. পুঁ.)

॥ দুই ॥

হেঁটে হেঁটে হরিদাস এলেন যশোরের অন্তর্গত বেনাপোল গ্রামে। কয়েকদিনের মধ্যেই গাঁয়ের লোকেরা তাঁর জন্যে ছোট্ট একখানি পাতার কুঁড়ে বেঁধে দিলেন। সে-ই কুটীরের দরজার কাছে হরিদাস তৈরি করলেন তুলসী-মঞ্চ। সে-ই তুলসী-মঞ্চ আজও রয়েছে। এখনও সেই তুলসী-মঞ্চের সামনে প্রতি বছর মহোৎসব হয়ে থাকে।

হরিদাস নিজের কুটীরে বসে হরিনাম গান করতেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তন করতেন। ভজন-কুটীর হরিনামের ঝঙ্কারে সব সময়ই মুখরিত থাকতো। ভিক্ষা করে তিনি দিন চালাতেন। অল্প-কালের মধ্যেই গাঁয়ের সকলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। সকলেই তাঁকে ভালোবাসতে লাগলো। তাঁর সুখ্যাতি চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

শিশুর মতো সরল ছিলেন তিনি। শিশুরা তাঁকে খুব ভালোবাসত। তাঁদের কোনও আচরণে তিনি দোষ ধরতেন না। হরিদাসও তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শিশুরা হাসলে তাঁর মুখে হাসি দেখা দিত। তারা নাচলে তিনি নাচতে শুরু করতেন। শিশুরা তাঁর কাছে এলে হাততালি দিয়ে তিনি তাদের সবাইকে হরিবুলি শেখাতেন। তারা নেচে নেচে হাতে তালি দিয়ে হরিবোল বলতো। হরিদাস তখন আরও খুশী হয়ে হাতের কাছে ফলমূল, বাতাসা যা পেতেন—সেই

সবই 'হরিবোল হরিবোল' বলে ছড়িয়ে দিতেন। খাবারের লোভে চারিদিক থেকে ছেলের দল জড়ো হতো। শুধু ছেলেপুলে নয়, বুড়োরাও আসতেন, যুবকরাও আসতেন। তাদের কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে নাচতেন, গাইতেন; কেউ কেউ-বা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতেন। এই হলো 'হরির লুট'। হরিদাসই এই 'হরির লুটের' প্রথম সূচনা করেন, আর বেনাপোলেই এর প্রথম প্রচার হয়।

হরিদাসের কুটীরে বহু পণ্ডিত বিদ্বানেরও সমাগম হতো। তাঁর কাছ হতে তাঁরা নানা সৎকথা শুনতেন। হরিদাসকে তাঁরা 'মহাজন' মনে করে অশেষ সম্মান দেখাতেন। হরিদাস যখন কীর্তন করতেন, তাঁরা সকলে একমনে সেই কীর্তন শুনতেন।

'হরিদাস ঠাকুরের কণ্ঠ সুধাময়।
কীর্তন শুনিলে গলিত পাষাণ হৃদয় ॥
আনন্দময় হইল তবে হরিদাসের স্থান।
দশ দিকে ছুটিল যশঃ সুগন্ধি সমান ॥' (গো. পুঁ.)

এমনি করে পরম আনন্দে আট দশ বছর বেনাপোলে তাঁর কেটে গেল। শেষে একদিন নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে যাবার তাঁর ইচ্ছা হলো। মায়ায় আবদ্ধ জীব তিনি নন। যে মুহূর্তে তাঁর ইচ্ছা হয়েছে, তখনি তিনি যাত্রা করলেন।

তিনি প্রথমে এলেন নবদ্বীপে। পরে শান্তিপুরে। শান্তিপুরে সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বাস করতেন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত ও পরম ভাগবত। দেশের ও সমাজের দারুণ দুরবস্থা দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রতিদিন চিৎকার করে ভগবানকে 'এসো এসো' বলে আহ্বান করতেন। শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে সবচেয়ে মানী লোক

ছিলেন। হরিদাস শান্তিপুরে এলে তিনি তাঁকে যত্ন করে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন।

'আচার্য গোঁসাঞী হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হইতে আদর করিয়া॥' (চৈ. ভা.)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে ধর্মশাস্ত্র পড়বার উপদেশ দিলেন। বয়স হয়েছে তখন হরিদাসের তিরিশের কাছাকাছি। তিনি অদ্বৈত প্রভুর কাছেই সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন। কিছুকালের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তাঁর নির্মল স্বভাব-চরিত্র, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ধর্মে ভক্তি প্রভৃতি দেখে প্রভু অদ্বৈতের পরম আনন্দ হলো। তিনি মুগ্ধ হলেন। শেষে একদিন তাঁকে গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন। তাঁর মাথা ন্যাড়া করিয়ে তাঁকে ডোর কৌপীন পরিয়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁর নাম রাখলেন 'ব্রহ্ম হরিদাস'।

'প্রভু কহে তোর নাম ব্রহ্ম হরিদাস।
হরিদাস কহে মুঞি হও তব দাস॥
তবে তিঁহো দৈন্যবেশ করিয়া ধারণ।
তিন লক্ষ নাম জপের করিল নিয়ম॥' (অ. প্র.)

এইদিন থেকে মোটামুটি মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন কঠোর এই নামযজ্ঞ সমানে চালিয়ে গিয়েছেন।

হরিদাস কিছুকাল শান্তিপুরে বাস করলেন। গঙ্গার গর্ভে বসে তিনি প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত রোজ তাঁর খাবার ব্যবস্থা করতেন। অদ্বৈত-ঘরণী সীতাদেবী সবার

আগে হরিদাসকে হবিষ্যান্ন দিতেন। এইজন্যে হরিদাসের সঙ্কোচের আর অবধি ছিল না। একদিন—

'হরিদাস কহে গোঁসাঞী করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেও কোন্ প্রয়োজন।' (চৈ. চ.)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিদাসের এ আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। তিনি হরিদাসকে প্রত্যহ খাইয়ে আনন্দ পেতেন, সুখী হতেন।

মুসলমান বংশের ছেলে বলে হিন্দুদের মধ্যে হরিদাসের অমূলক অখ্যাতি ছিল। কিছুকালের মধ্যে সে সংবাদ শান্তিপুরেও এসে পৌছুলো।

হরিদাসকে দীক্ষা দিয়েছেন। হরিদাস তাঁর বাড়ীতে দুই বেলা খান, এইজন্যে সমাজে শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা শুরু হলো।

হরিদাসকে নিয়ে সমাজে শ্রীঅদ্বৈতের বিরুদ্ধে খুব আলোড়ন চলতে লাগলো। সমাজের বহু গণ্যমান্য লোক হরিদাসকে ত্যাগ করবার জন্যে একদিন শ্রীঅদ্বৈতের কাছে এসে দাবী জানালেন।

শ্রীঅদ্বৈত দৃঢ়ভাবে বললেন—না, তা হতে পারে না।

'প্রভু কহে, নাহি বুঝি সজ্জাতি দুর্জাতি।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি॥' (অ. প্র.)

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মে সমাজের মাথা যাঁরা—তাঁদের অনুরোধ, শাসন উপেক্ষা করে—এমনধারা দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সতেজ উক্তি করা কত বড় বিপ্লবের কথা, তা ভাবলে আজও অবাক হয়ে যেতে হয়! মনে হয়, আর আর লোকেরা ছিলেন যেন

তৃণগুল্ম, অদ্বৈত সেখানে এক বিরাট বনস্পতি—মাথা ' করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর সবাইকে ছায়া দিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন।

*　　*　　*　　*

দিন যেতে লাগলো। হরিদাসকে শ্রীঅদ্বৈত যেন আরও বেশী করে ভালোবাসতে লাগলেন। একদিন অদ্বৈতের পিতৃ-শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হলো। হরিদাসের মতো ভালো ব্রাহ্মণ আর নেই, এই মনে করে শ্রাদ্ধের পরে অদ্বৈত হরিদাসকে মহাসমাদরে শ্রাদ্ধ পাত্র দান করলেন।

হরিদাস বললেন, প্রভু, ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধান্ন যবনকে খাওয়ালে? না জানি, এর পর তোমার মনে আরও কি আছে?

'মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়॥
আচার্য কহেন তুমি না করহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥'　　(চৈ. চ.)

অদ্বৈত বললেন, তুমি ভোজন করলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল-লাভ হয় হরিদাস।

এই ঘটনায় আগুনে যেন ঘির আহুতি দেওয়া হলো। ফলে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। অদ্বৈতের ছাত্রেরা তাঁর ওপরে খুব রেগে গেল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণরা রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। অদ্বৈত কিন্তু অটল রইলেন নিজের সংকল্পে। নিজে যেটা সত্য বলে

জেনেছেন, বুঝেছেন, দশজনের কথায় সেটা ত্যাগ করবেন? যাঁকে একজন কৃতী-পুরুষ বলে জেনেছেন, আর দশজনে তাঁকে অস্বীকার করছে বলে তা মিথ্যা হয়ে যাবে? আর, সেই মহামিথ্যার কাছে তিনি নোয়াবেন মাথা?

অদ্বৈত সমাজচ্যুত হলেন।

অদ্বৈতের ছাত্ররা নানাভাবে হরিদাসকে বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। হরিদাস কিন্তু তাদের উপরে কিছুতেই বিরূপ হতেন না। হরিদাস কোন হৈ-চৈ, কোন আন্দোলনের মাঝে থাকতেন না। তিনি নিজের মনে শুধু নাম জপই করতেন। যাহোক একদিন হরিদাস শান্তিপুর ত্যাগ করবার জন্যে প্রভু অদ্বৈতের অনুমতি চাইলেন।

'প্রভু কহে তো বিচ্ছেদে মোর বুক ফাটে।
নিষেধিতে না পারি ভজনের বিঘ্ন ঘটে॥' (অ. প্র.)

আচার্যের অনুমতি নিয়ে হরিদাস শান্তিপুর ত্যাগ করে আবার ফিরে এলেন বেনাপোলে। এবার একাদিক্রমে বারো তেরো বছর সেখানে বাস করলেন।

॥ তিন ॥

হরিদাস বেনাপোলে ফিরে এলেন। এসে সেই আগের ভজন-কুটীরেই বাস করতে লাগলেন। তিনি রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। অবিরাম নাম জপ করতেন বলে, এই সময় তাঁর কুটীরে লোক সমাগম আগের তুলনায় খুব কমই হতো। কারণ, হরিদাসের লোকজনের সাথে কথা বলবার সময় মিলতো না। ভজন-কুটীরের দরজাও প্রায় সব সময় বন্ধ থাকতো। নানাকারণে এই সময় স্থানীয় কয়েকজন লোক হরিদাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। একদিন তাদের কয়েকজন বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের কাছে গিয়ে নালিশ করলো।

'হবুল্যা কাজীর বেটা করে হরিনাম।
ব্রাহ্মণে শুনিলে তার কিসে থাকে মান॥
গেল ধর্ম, গেল জাতি, গেল কুলমান।
ইহাকে শাসন কর তুমি রাজা খান॥' (গো. পুঁ.)

রামচন্দ্র বললেন, শাসন আমি তার অবশ্যই করবো। কিন্তু বিনা কারণে জোর করে তো কাউকে শাসন করা চলে না। ছুতো চাই। তোমরা ছুতো খোঁজ। ছুতো পেলে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেবো।

ছুতো খুঁজতে গিয়ে কেউ হরিদাসের কোন দোষ দেখতে পেল না। অগত্যা তাঁর গুণকেই তারা দোষ বলে ধরে নিল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

'কেহ বলে হরিনাম করি উচ্চরোলে।
করিল অস্থির বেটা পাড়ার সকলে॥
কেহ বলে তিন হাত বহির্বাস পরে।
কোনরূপে পয়সার সাশ্রয় করে॥
কেহ বলে বেটার জন্মের ইতিহাস।
হবুল্যা কাজীর বেটা ব্রহ্ম হরিদাস॥
কেহ বলে যবন হইয়া বলে হরি।
শুনিলে তা গঙ্গাস্নান প্রায়শ্চিত্ত করি॥
কেহ বলে ঘোর কলি হঞাছে এখন।
পুরাণের বক্তা তাই হঞাছে যবন॥'　　(গো. পুঁ.)

এমনিধারা হরিদাস সম্বন্ধে নানাজনে নানা বাক্যে অভিযোগ জানাতে লাগলো। শেষে গাঁয়ের দুষ্ট লোকদের মনস্তুষ্টির জন্যে রামচন্দ্র খান হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করবার এক ছল করলেন।

বেনাপোলে সে সময়ে অসামান্যা সুন্দরী এক নটী ছিল। নাম লক্ষহীরা। সে ছিল রামচন্দ্রের অনুগৃহীতা।

'এইকালে হীরা নটী লক্ষহীরা নাম।
রূপসী না ছিল ভবে তাহার সমান॥'　　(গো, পুঁ.)

রামচন্দ্র লক্ষহীরার কাছে গেলেন। তিনি তাকে নিযুক্ত করলেন হরিদাসকে দমন করবার জন্যে। হীরা সম্মত হলো।

'হীরা কহে, হউক সে দেব যোগেশ্বর।
তিন দিনে বানাইব তাহাকে নফর॥'　　(গো. পুঁ.)

রামচন্দ্র তখন সকলকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, হীরা একবার হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করলেই, তাকে যৎঘৃণিত অপমান করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো।

সেদিন—

'হীরা নটী বৈকালে সাজে কিন্নরী সজ্জায়।' (গো. পুঁ.)

'একেত চান্দের বর্ণ অলঙ্কার পরে।
মণিরত্নে তনু তার ঝলমল করে॥
সন্ধ্যাকালে নির্জন কুটীরে হরিদাস।
হেনকালে হীরা আসি হৈল পরকাশ॥' (গো. পুঁ.)

হীরা অত্যন্ত বিনয় বচনে হরিদাসকে বলতে লাগল—

'কার্তিকের তুল্য তুমি রূপে রূপবান।
বৃহস্পতি তুল্য তুমি বিদ্যা জ্ঞানবান॥
রূপগুণসিন্ধু হইয়া সংসারে আইলে।
উপবাস কষ্ট সহি এবার মরিলে॥
জীবনে সুখের মুখ নাহি নিরখিলে।
নীরস তরুর মত কাল গোঙাইলে॥
হের আমি তোমার দুঃখ বিচারিয়া মনে।
আপনে গোপনে আসিল কেহ নাহি জানে॥
গোপনে গোপনে আমি নিতই আসিব।
নিতই তোমারে আমি তুষিয়া যাইব॥' (গো. পুঁ.)

হরিদাস তার কথায় কান দিলেন না।

হীরা বলে চললো, তোমার মতো রূপবান লোক দেখিনি। তোমাকে সকলেই মান্য করে। তুমি আমার কথা শোনো।

'শুনিয়া হীরার বাক্য ঠাকুর হরিদাস।
ভালো ভালো বলিয়া হাসিল মৃদুহাস॥
যে তপস্যা করিয়াছি তার ফলে বিধি।
আজ মোরে পাঠাইল তোমা হেন নিধি॥
তিন লক্ষ নাম আমি করি সঙ্কীর্তন।
এইখানে বসি তুমি করহ শ্রবণ॥
নাম সমাপ্ত হইলে করিব যাহা বল।
নীরবে বসিয়া থাক না করিহ গোল॥' (গো. পু.)

হরিদাসের ছল হীরা ধরতে পারলো না। সে অন্তরে সত্য বলেই ওই কথা বুঝলো।

হরিদাস এক মনে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করলেন।

হীরা নাম-কীর্তন শুনতে বসলো। শুনতে শুনতে সব ভুলে গেল সে। ভুবনমোহন হরিদাসের রূপ। সে রূপ দেখতে দেখতে আর নাম-কীর্তন শুনতে শুনতে হীরা তন্ময় হয়ে পড়লো। এদিকে নাম সংকীর্তনে রাত্রিও ভোর হয়ে গেল। হীরার মনে হলো, দীর্ঘ রাত্রি যেন এক দণ্ডে চলে গেল!

হরিদাস বললেন, রাত্রি ভোর হয়ে গিয়েছে। নাম-সংখ্যা আমার পূর্ণ হলো না। যা হবার হয়েছে। মনের বাঞ্ছা তোমার আজ অপূর্ণ রয়ে গেল। তুমি যদি কাল আস, আর কাল যদি আমার নাম-কীর্তন শেষ হয়, তবে কাল তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবো।

'বৃথা সারারাত্রি তুমি কৈলে জাগরণ।
অপরাধ না লইও, এই নিবেদন॥' (গো. পুঁ.)

হরিদাসের কথায় খুশী হয়ে হীরা বাড়ী ফিরে এলো। রামচন্দ্রকে জানালো, আজ তার নাম-কীর্তন শেষ হয়নি। নাম-কীর্তন শেষ হলে অবশ্যই সে আমার বাসনা পূর্ণ করতো।

তারপরে—

'স্নানাহার করি হীরা শয়ন করিল।
ঘুমাবেশে হরিদাসে দেখিতে লাগিল॥
শুনিতে লাগিল তার নাম সংকীর্তন।
জাগিয়া ঘুমায় ফিরে দেখিতে স্বপন॥' (গো. পুঁ.)

সেদিন সন্ধ্যার পরে আবার হীরা অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে হরিদাসের দুয়ারে উপস্থিত হলো।

হীরাকে দেখে হরিদাস খুবই সমাদর করলেন। বললেন, এখানে বসে তুমি নাম-কীর্তন শোনো।

'তার পরে হরিদাস ধরিলেন নাম।
নয়নে ঝরয়ে অশ্রু গাত্রে বহে ঘাম॥
হীরা নটী জন্মিয়া যা কভু দেখে নাই।
সাধু-সঙ্গ গুণে আজ নিরখিল তাই॥' (গো. পুঁ.)

হীরা একদৃষ্টে হরিদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সৌম্য মূর্তি, প্রশান্ত বদন, তায় স্বর্গের দীপ্তি! সে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলো হরিদাসের মধুর কণ্ঠস্বর! শুনতে লাগলো কর্ণরসায়ণ সুমধুর হরিনাম!

হীরার মনে হতে লাগলো যেন অবিরাম অমৃতবর্ষণ চলেছে! হীরা মুগ্ধ হয়ে গেল!

'গায়িকার সেরা হীরা আপনা ভুলি যায়।
ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুরের সঙ্গে নাম গায়॥
নিমেষে পোহাল রাতি নামের ঝঙ্কারে।
আজ হীরা বেশী বাক্য মুখে না উচ্চারে।' (গো· পুঁ·)

হরিদাস বললেন, নাম-কীর্তন করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। কি করবো, আজও নাম-সংখ্যা শেষ হলো না। তুমি বল, এত কালের ব্রত-ভাঙা কি ভালো?

'দুইরাত্রি আসি তুমি মনে পাইলে কষ্ট।
মোর লাগি তোমার কষ্ট মোর দুরদৃষ্ট॥
সম্ভবতঃ আজি নাম শেষ হৈতে পারে।
আজি আসিলে তোমারে তুষিব অঙ্গীকারে॥
হীরা নটী তাহে নাহি কর্ণপাত করে।
প্রণমি নীরবে চলে আপনার ঘরে॥
রামচন্দ্র আসি অগ্রে আছিল বসিয়া।
হীরা আজি আসিলেক ভারমুখ নিয়া॥' (গো. পুঁ.)

রামচন্দ্র যত কথা বলেন, হীরা কর্ণপাতও করে না। কখনও বা আনমনা হয়ে অন্য উত্তর দেয়। মনে মনে ভাবছে—

'যার মন আহার নিদ্রা সব ছাড়িয়াছে।
তার কাছে আমাদের যাওয়া আসা মিছে॥' (গো. পুঁ.)

* * * *

তারপরে—

কোনরূপে স্নানাহার করি সমাপন।
দ্বার বন্ধ করি হীরা করিল শয়ন॥
ভাবিতে লাগিল হরিদাসের বদন।
কি মাধুর্য, ঠাকুরের স্বভাব সুন্দর।
কি নির্মল হরিপ্রেমে মত্ত যোগিবর॥
মূর্তিমান ধর্ম সদা সঙ্গে আছে যার।
তার বৈরাগ্য নষ্ট করে সাধ্য আছে কার॥' (গো. পুঁ)

এইভাবে ভাবতে ভাবতে হীরার মনে দারুণ অনুতাপ এলো। দুই চোখ দিয়ে তার জলধারা গড়াতে লাগলো।

'এত ভাবি ভাসে হীরা দুনয়নের জলে।
সাধুসঙ্গে জীবের এমনি ভাগ্য মিলে॥
সেদিন দিবসে আর ঘুমাতে নারিল।
অনুতাপ অনলে সে পুড়িয়া মরিল॥
আলু থালু বেশ কেশ নয়ন তাহার।
হেন পরিণাম সাধুসঙ্গ মহিমার॥
আবার আসিল রাত্রি হীরা বাহিরিল।
আজ আর বেশ পরি কেশ না বান্ধিল॥
অন্তরে জ্বলান অনুতাপের আগুন।
সজল নয়নে দুঃখে মরা শতগুণ॥' (গো. পুঁ.)

হীরা গিয়ে নীরবে নতশিরে হরিদাসের কুটীর দরজায় দাঁড়ালো। 'এসো'—বলে সস্নেহে হরিদাস তাকে ডাকলেন।

তখন·

'করজোড় করি তবে হীরা ক্ষমা চায়
সজল নয়নে নতশিরেতে দাঁড়ায় ॥
হরিদাস ঠাকুর অন্তর জানি তার।
ছলবাণী তারে না কহেন আজি আর
বসিলেন সংকীর্তনে হরে কৃষ্ণ বলি।
পড়িল প্রেমের অশ্রু নয়ন উথলি ॥
ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর শুনি হরিনাম।
মূর্ছিতা হইয়া হীরা পৈল ধরাধম ॥' (গো. পুঁ.)

মূর্ছা ভাঙলে হীরা—

'কত কৈল আর্তনাদ নাহি লেখা জোখা।
কত কৈল কাকুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা ॥' (গো. পুঁ.)

হীরার আর্তনাদ থামে না। বারবার সে ক্ষমা চাইতে লাগলো। বারবার জানতে চাইলো, কিসে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তারপর ধীরে ধীরে সে রামচন্দ্রের সব ষড়যন্ত্রের কথা হরিদাসকে জানালো।

হরিদাস বললেন, রামচন্দ্রের সব কৌশল আমি আগে থাকতেই জানতাম। অজ্ঞান তারা। তারা মায়া-মোহে মত্ত। তাদের এই আচরণ স্বভাবে করায়। কখনও পরের নিষেধ তারা শোনে না।

হরিদাস আরও বললেন—

'শুদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন ছিল তোমার অন্তরে।
তিনদিন রহিনু তাহা জাগরণ তরে ॥

এতেক কহি হরিনাম দিলেন তার কানে।
বসিতে কহিলেন তারে আপনার আসনে ॥
কহিলেন সুকর্মে সম্পত্তি কর দান।
প্রতিদিন জপ কর তিন লক্ষ নাম ॥
বিলাস ভোগ ছাড়ি ধর শ্রীগোবিন্দ সেবা।
ইহকাল যাবে সুখে পরকাল পাবা।
এত কহি ভোরের আগে বেনাপোল ছাড়ি।
ঠাকুর চলেন চান্দপুরে বলরামের বাড়ী ॥' (গো.পুঁ.)

হীরাকে নানা উপদেশ দিয়ে নিজের আসনে বসিয়ে হরিদাস নিভৃতে বেনাপোল ত্যাগ করে চলে গেলেন। জীবনে আর কোনদিন তিনি বেনাপোলে আসেননি।

হীরা বাড়ি ফিরে এলো সকালবেলায়। সেখানে সাক্ষাৎ হলো রামচন্দ্রের সঙ্গে।

'রামচন্দ্র পুছে হীরা কহত মঙ্গল।
হীরা কহে কৃষ্ণনামে সর্বত্র মঙ্গল ॥
রামচন্দ্র কহে তবে বৈরাগীর ঠাঁই।
তোরে পাঠাইয়া কাজ ভাল করি নাই ॥
ভাঙিতে বৈরাগীর ঘাড় দিনু পাঠাইয়া।
কি আশ্চর্য তোর ঘাড় গেল সে ভাঙিয়া ॥
হীরা কহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিনি হন।
পশু তুই কি জানিবি তান আচরণ ॥
তোর সঙ্গে নরকের পথ যাইতেছিনু।
তান কৃপাবলে পথ দেখিতে পাইনু ॥' (গো. পুঁ.)

রামচন্দ্র অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। দারুণ কটুবাক্য বলে হীরাকে অপমান করলেন।

কোনও কথা না বলে হীরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

হীরা তার সকল ঐশ্বর্য, বাড়ী-ঘর অলঙ্কার বিলিয়ে দিল। পরলো ভিখারিণীর বেশ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই।

'আকাশে উড়লো তার যশের নিশান।'

তারপরে—

'দিনে দিনে হৈল হীরা মহান্তি প্রধান।
নটী হঞা ভাগ্যবতী কে তাহার সমান॥
হরিদাস ঠাকুর কৃপা কৈল যে জনারে।
বড় বড় মহান্ত যাইত দেখিতে সে জনারে॥' (গো.পু.)

এই হীরাই কালে দুটো বড় রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন। একটি নীলাচলে, অন্যটি বেনাপোল হতে দক্ষিণ রাঢ় পর্যন্ত সোনাই নদীর উপকূল বরাবর।

·

হরিদাস আবাল্য তপস্বী। নারীর সঙ্গে তাঁর জীবনের কোন সংযোগ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম হীরা—এই লক্ষহীরা। সে সংযোগের পরিসমাপ্তি এমনি করেই।

এদিকে রামচন্দ্রের অবস্থা হলো শোচনীয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন পশ্চিম মুলুক হতে বহু মুসলমান সৈন্য রামচন্দ্রের বাড়ী আক্রমণ করে। তারা শুনেছিল, রামচন্দ্রের প্রচুর ধনদৌলত আছে। তারা এসেছিল সেই সব লুঠপাটের জন্যে।

রামচন্দ্রের এক বিশ্বাসী অনুচর ছিল। নাম তার কালুসর্দার। সৈন্যরা আসছে শুনে রামচন্দ্র ও তাঁর লোকজনদের তাঁরই বাড়ীর এক চোর-কুঠুরীর মধ্যে লুকিয়ে রেখে কালু ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়, আর দরজা ইট-পাটকেল দিয়ে ঢেকে রাখে। নিজে থাকে দীঘির পাশে এক উঁচু গাছের পরে লুকিয়ে। সৈন্যরা এসে তাকে দেখতে পায়। ভয়ে সে দীঘির জলে লাফিয়ে পড়ে। সেখানে সে মারা যায়। তখন সৈন্যেরা রামচন্দ্রের বাড়ী তছনছ করে ধনদৌলত নিয়ে চলে যায়।

এদিকে সেই চোর-কুঠুরীতে রামচন্দ্র ও তাঁর লোকজন না খেয়ে মারা যায়।

॥ চার ॥

হরিদাস বেনাপোল ছেড়ে পশ্চিম দিকে চলতে লাগলেন। হীরার পরীক্ষার পরে তাঁর খ্যাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে দেখবার জন্যে বহু লোক জড়ো হয়। তাঁর দৈন্য, তাঁর সরল ব্যবহার, সকলের উপরে তাঁর সৌম্য মূর্তি সবাইকেই মুগ্ধ করে। হরিদাসপুর গ্রামে কয়েকদিন থেকে তিনি চলে এলেন হুগলীর নিকটে চান্দপুর গ্রামে।

সে সময়ে চান্দপুরে বলরাম আচার্য নামে একজন নাম-করা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি হরিদাসকে আদর-যত্ন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সেখানে বাড়ীর একপাশে ছোট্ট একখানি পাতার কুটীর তৈরি করে হরিদাস বাস করতে লাগলেন। বলরাম আচার্যের সাথে হরিদাসের আগে থাকতেই পরিচয় ছিল।

বলরাম আচার্যের বাড়ীতে এই সময় এক তরুণ বালকের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় হয়। এই বালক হরিদাসের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। উত্তরকালে ইনি রঘুনাথদাস গোস্বামী নামে বিখ্যাত হন।

'হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥' (চৈ. চ.)

রঘুনাথ ছিলেন সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ধনী জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস মজুমদার, এই দুই ভাই-এর একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী। গোবর্ধনের তিনি একমাত্র সন্তান।

হিরণ্য ও গোবর্ধন একদিন পরম সমাদরে হরিদাসকে নিয়ে আসেন তাঁদের গৃহে। কথায় কথায় সেখানে তর্ক উঠলো—উচ্চৈঃস্বরে নাম করা কেন? কৃষ্ণনাম জপ করলে কি হয়?

'কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়॥' (চৈ. চ.)

হরিদাসের নম্র জবাবে সবাই সন্তুষ্ট হলেন। কেবল একজন দুষ্ট লোক হরিদাসকে সেখানে অপমান করে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে লোকের দেখা দিল ভীষণ কুষ্ঠরোগ। তার নাক, হাত-পায়ের আঙুল সব খসে পড়লো। হরিদাস এই দৃশ্য সইতে পারলেন না। তিনি চান্দপুর ছেড়ে চলে গেলেন।

আবার এলেন হরিদাস শান্তিপুরে। এসে তিনি শ্রীঅদ্বৈতের চরণ আশ্রয় করলেন। আবার গঙ্গাগর্ভে তাঁর জন্যে গোঁফা তৈরি হলো। হরিদাস অহর্নিশ সেখানে থাকতেন। কেবলমাত্র প্রসাদ পেতেন এসে শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে। গোঁফায় বসে হরিদাস অবিরাম নাম জপ করতেন।

একদিন আপন-ভুলে নাম করতে করতে শান্তিপুর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে ফুলিয়া গ্রামে হরিদাস উপস্থিত হলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন।

'ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সবায় তাহারে দেখি হইল বিহ্বল॥' (চৈ ভা.)

অল্প সময়ের মধ্যে ফুলিয়ার বহু ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হলেন। হরিদাস যখন আত্মহারা হয়ে 'হরি হরি' বলে নাচতেন, তখন সকলে তাঁর দেখাদেখি তাঁর সঙ্গে নাচতেন। ফুলিয়ায় তাঁর বাসস্থান এখনও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। তাকে 'হরিদাসের' পাট বলে সকলে জানে। অনেকে বলছেন, মাঝে মাঝে এখনও সেখানে নানা অলৌকিক ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সুলতান হুসেন শাহ তখন গৌড়ের সম্রাট। তাঁর অধীনে ফুলিয়ার কাছে যে কাজী বাস করতেন, নাম ছিল তাঁর গোরাই কাজী। তাঁর কাছে ফুলিয়ার ও আশে-পাশের বহু মুসলমান গিয়ে একদিন হরিদাসের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন।

'ফুলিয়াতে হরিদাস নামে একজন।
হিন্দুয়ানি কার্য করে হইয়া যবন॥
আখের খাইল লোকে হৈল উপহাস॥
ক্রমশঃ যবন ধর্ম হইবে বিনাশ॥' (অ. প্র.)

তাদের কথা হলো, হরিদাস মুসলমান হয়ে হিন্দুর মত হিন্দুর ধর্ম প্রচার করে বেড়ান। দিন-রাত তিনি 'হরি হরি' করেন। হিন্দু-সমাজ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন তিনি। ফলে হিন্দু-ধর্মের প্রচার বাড়ছে। ইসলাম-ধর্মের প্রচার কমে যাচ্ছে।

কাজী সাহেব হরিদাসকে ডেকে আনলেন। তাঁকে কত বোঝালেন। হিন্দুয়ানি করতে বার বার নিষেধ করলেন।

হরিদাস কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি জীবনে যা সত্য বলে বুঝেছেন, অপরের কথায়, অন্যের শাসনে বা রক্তচোখ দেখে তা ত্যাগ

করবেন কেমন করে? তাছাড়া, ধর্ম-আচরণ করা তো নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যেমন অভিরুচি, যার প্রাণে যেমনটি চায়, তাই-ই সে পালন করবে, আচরণ করবে। এই ব্যাপারে অপরের বা শাসকের কথা বলা শুধু অসঙ্গত নয় অপরাধ।

যখন দেখলেন, হরিদাস কিছুতেই তার কথা শুনলেন না, তখন কাজী সাহেব তাঁকে হাতে-পায়ে বেঁধে বন্দী করলেন। বন্দী করে শিকল পরা অবস্থায় তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন গৌড়ে। গৌড় সে সময় সারা বাঙলা দেশের রাজধানী। হরিদাসকে গৌড়ের কারাগারে রাখা হলো।

গৌড়ে হরিদাস যে কারাগারে বন্দী ছিলেন, সেই কারাগারে সে সময়ে বহু গণ্যমান্য রাজা-মহারাজাও বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা সকলে হরিদাসকে প্রণাম করলেন। তাঁর কাছে সকলে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। 'যে যেমন আছ তেমনিই থাক'—এই বলে হরিদাস সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। এমনিধারা অদ্ভুত আশীর্বাদে সকলেই মন-মরা হয়ে পড়লেন। তাঁদের কারাগারেই দিন কাটাতে হবে? তাঁদের বিষণ্ণ অবস্থা দেখে হরিদাস সবাইকেই বুঝিয়ে বললেন, কারাগার হলো নিভৃত স্থান। এই-ই তো ভগবানের আরাধনা করবার উপযুক্ত ঠাঁই। সকলে তাঁর কথা বুঝলেন।

হরিদাসের বিচার আরম্ভ হলো। সাধুর বিচার। মুসলমানে হিন্দু-ধর্ম প্রচার করছে—এই অভিযোগ। তখনকার দিনে এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে সকলের ধারণা। তাই সকলেরই কৌতূহল হলো এই বিচার দেখতে। বিচারালয় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কাজী সাহেব নিজে উপস্থিত ছিলেন বাদশাহের দরবারে।

হরিদাসের নয়নাভিরাম মূর্তি দেখে সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। তাঁর ছিল—

'আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্বমনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥' (চৈ. ভা.)

তাঁকে দেখে সবাই মুগ্ধ হলো। সেখানে কথায় কথায় প্রকাশ পেল, হরিদাস নাকি হবিবুল্যা কাজীর পুত্র। বাদশাহ তাঁর চেহারা দেখে বুঝেছিলেন, তাই-ই সত্যি হবে। হরিদাস নিশ্চয়ই মুসলমানের মধ্যে বড় ঘরের ছেলে হবেন।

তাই—

'ভাই বলি মুলুকপতি তাহানে পুছিল।'

—তুমি বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানের ছেলে। তুমি রাতদিন কেন হরিনাম করো? কেন হিন্দুয়ানি তোমার?

'যবন হইয়া কেন হরিনাম গাও।
নিজ দেশ ছাড়ি কেন পর দেশ যাও॥
আপনার ধর্ম কর আল্লা আল্লা বল।
ভেস্ত ছাড়ি দোজকেতে কিবা লোভে চল॥
হরিদাস কহেন, যেই আল্লা সেই হরি।
যাহে মোর রুচি মুঞি সেই নাম করি॥
নিজ মনে নিজে কান্দি হাসি নাচি গাই।
ভ্রমেও কাহারও কোনও অনিষ্টেতে নাই॥
সর্বলোক সেই এক ঈশ্বর সন্তান।
অজ্ঞ নরে ভেদ করে হিন্দু মুসলমান॥' (চৈ. ভা.)

—হিন্দু মুসলমান সবাই একই ঈশ্বরের উপাসনা করে। কোরাণে পুরাণে একই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারিত। তিনি আমাদের যা করাচ্ছেন আমরা তাই-ই করছি।

* * *

'শুন বাপ! সবারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥' (চৈ. ভা.)

বাদশাহ প্রথমে হরিদাসকে অনেক করে বোঝালেন। শেষে ভয় দেখালেন, তাঁকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

হরিদাস একটুও ভীত হলেন না। তিনি বললেন, সত্য বলে যা জেনেছি, আপনার ভয়ে ভীত হয়ে তাই ভুলে যাবো? যা মিথ্যা তাকে ধরবো আঁকড়ে? সত্যকে ছাড়লে বৃথাই জীবন। বেঁচে থেকে লাভ কি? তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—

'খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥' (চৈ. ভা.)

কঠোর সেই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বিচার সভার সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল! চমকিত হলো সকল লোক! কই, এমন অপূর্ব কথা তাঁরা তো কেউ কখনও শোনেননি! এমন তেজস্বিতা, নিশ্চিত মৃত্যুকে এমনভাবে উপেক্ষা করা—সত্যের জন্যে এমন দৃঢ়তা, সত্যকে আঁকড়ে ধরে জীবনসর্বস্ব করতে এমনধারা বলিষ্ঠ উক্তি জগতে তো বড় বেশী শোনা যায়নি!

যারা ধর্মান্ধ, যারা গোঁড়া, নেহাৎ হতভাগ্য যারা, তারা এই কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না। বাদশাহের কাজী দেখলেন, তাঁদের

ধর্মের অবমাননা হলো এতে। বিধর্মীরা এতে প্রশ্রয় পাবে। তিনি রাগে ক্ষেপে গিয়ে হরিদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। যেমন তেমন করে প্রাণ বধ করা নয়! বাইশ বাজারে কোড়া (বেত) মারতে মারতে তাঁর প্রাণ বধ করবার আদেশ দেওয়া হলো।

হরিদাসের কিন্তু তখনও নাম চলছে। মুখে চলছে মুহুর্মুহুঃ হরিনাম।

ঘাতকেরা তাঁকে নিয়ে চললো।

গৌড় তখন প্রকাণ্ড শহর। সেই শহরে তখন বাইশটি বাজার ছিল। দুই তিনটি বাজারে কোড়া মারলেই লোক মারা পড়তো। হরিদাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে বাজারে বাজারে কোড়া মেরে ঘোরানো হতে লাগলো। ঘাতকদের কোড়া মারার বিরাম নেই। হরিদাসেরও হরিনাম জপের বিরাম নেই। যে দেখে এই করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য, সেই-ই অঝোরে কাঁদতে লাগলো। হরিদাস নির্বিকার! সৌম্য মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি! মুখের দীপ্তি আরও শতগুণ বেড়ে গিয়েছে! সারা দেহে স্বর্গীয় দীপ্তি!

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
রামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥' (চৈ. ভা.)

ঘাতকরা হরিদাসকে মারছে, নির্মমভাবে কোড়া মারছে, তাতে তাঁর যত না লাগছে, তার চেয়ে বেশি লাগছে অন্য আর এক কারণে। তিনি ভাবছেন অপর কথা। যারা তাঁকে মারছে তাদের কথা। তারা এত নির্দয় নির্মম হলো কি করে? ওদের কি হবে? কি

হবে ওদের পরিণাম ? এই চিন্তায় হরিদাস আকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তাই বার বার শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

'এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥' (চৈ. ভা.)

—প্রভু, তুমি এদের ক্ষমা করো। তুমি এদের অনুগ্রহ করো। এদের ওপর রুষ্ট হয়ো না। আমার উপর এরা যে অত্যাচার চালাচ্ছে, আমার উপরে যে নির্যাতন চলছে, তাতে এদের কোনও অপরাধ নেই। তুমি এদের কোনও অপরাধ নিয়ো না। প্রভু, তুমি এদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

এই ঘটনার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে আর এক মহাত্মার মুখ দিয়েও এমনিধারা অপূর্ব কথা একদিন শোনা গিয়েছিল।

যীশু বলেছিলেন—'প্রভু, পিতা, এরা কি করছে, তা জানে না, বোঝে না। তুমি এদের ক্ষমা করো।'

অপূর্ব এই জাতীয় কথা শুনলে এখনও শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা আপনিই নত হয়ে পড়ে। মন ভক্তিতে ভরে যায়। বিস্ময়ে আমরা হতবাক্ হয়ে পড়ি।

যারা কোড়া মেরে তাঁর পিঠে রক্ত বইয়ে দিচ্ছে, যারা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করছে, তিনি শুধু তাদের জন্যেই ব্যথা পাচ্ছেন! কাতরভাবে বলছেন—

'এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥'

হরিদাস ভাবলেন, যারা বেত মারছে, তারা রাজভৃত্য। তারা রাজাদেশ পালন করছে মাত্র। তাদের কি দোষ? তিনি তাদের জন্য ভগবানের কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন—

'এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।'

চারদিক হতে নীরব জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো।

বাইশ বাজারে কোড়া খেয়েও যখন হরিদাস মরলেন না বা সত্য পরিত্যাগ করলেন না, বরং মুখে তখনও প্রশান্ত ভাব দেখা দিচ্ছে, মুখের দীপ্তি আরও বেড়ে গিয়েছে, তখন ঘাতকেরা পড়লো মহা ফাঁপরে। হয়তো রাজাদেশে তাদেরই উপর নির্মম অত্যাচার চলবে, হয়তো বাদশাহ বুঝবেন তারা তাঁর আদেশ যথাযথ পালন করেনি। তাই হরিদাস তাদের আশ্বস্ত করে—

ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।'

তিনি সমাধিস্থ হলেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস রইলো না। বাইরে থেকে তাঁকে মৃত বলেই মনে হতে লাগলো। তখন সকলে তাঁকে মরা মনে করে গৌড় দুর্গের দরজার বাইরে এনে রাখলো। কবর দিলে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে, গঙ্গায় ফেললে তাঁর অধোগতি হবে, এই ভেবে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যেই কাজী সাহেব তাঁর দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

হরিদাসের দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হলো।

হরিদাস ভেসে ভেসে কিছুদূরে গিয়ে উঠলেন। তিনি কূলে এসে বসলেন। শীঘ্রই এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জাতি-ধর্ম ভুলে বহু লোক এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

শোনা যায়, এর পরে বাদশাহ নাকি হরিদাসের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। প্রচার করে দিয়েছিলেন, হরিদাস তার রাজ্যমধ্যে অবাধে যেখানে খুশি বেড়াবেন। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না।

ভবিষ্যতে গৌড়ের অত্যাচারের কথা কখনও উঠলে হরিদাস সংকুচিত হয়ে পড়তেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতেন, কালের দোষে তাঁকে ভগবানের নিন্দা শুনতে হয়েছিল। তাই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। ভগবান পরম দয়ালু কিনা তাই! তাই দয়াল ঠাকুর আঘাত দিয়ে তাঁকে পরম স্নেহ দেখিয়েছেন।

কয়েকদিন বাদে হরিদাস ফুলিয়া যাত্রা করলেন।

॥ পাঁচ ॥

হরিদাস ফুলিয়ায় এসেছেন। আগে তিনি শান্তিপুর ছেড়েছিলেন এই কারণে যে, প্রভু অদ্বৈত সমাজে অপমানিত হয়েছেন তাঁর জন্যেই। তাঁর মতো মহা মানী লোককে উপহাস করেছে তাঁকে উপলক্ষ্য করেই। এবার তিনি তাই কোনও গৃহে না উঠে গাছতলায় আশ্রয় নিলেন।

লোকে দেখলো, এক সাধু এসেছেন। তাঁর সোনার বরণ, সুন্দর চেহারা। মলিন বসন তাঁর, গায়ে ছেঁড়া কাঁথা। তবু দেহ থেকে যেন অপূর্ব দীপ্তি বের হচ্ছে!

সাধুকে দেখতে ধীরে ধীরে বহু লোক জড়ো হলো। সাধুর ব্যবহারে, কথাবার্তায় সকলেই মুগ্ধ হলো।

ফুলিয়ায় এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে সেদিন বিবাহ-উৎসব। সেখানে মহা ধুমধাম। সেই উৎসবে সকলে সাধুকে আদর করে নিয়ে এলেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলের আগে তাঁরা তাঁর খাবার ব্যবস্থা করলেন।

যথাসময়ে সেই উৎসব বাড়ীতে প্রভু অদ্বৈত এসে উপস্থিত হলেন। নতুন সাধুকে দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সাধু আর কেউ নন, তিনি তাঁরই প্রাণাধিক প্রিয় হরিদাস!—যাঁকে একদিন শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়াতে তিনি সমাজচ্যুত হয়েছিলেন! আজ তাঁকেই সকলে যত্নের সঙ্গে অভ্যর্থনা করছে, সম্মান দেখাচ্ছে!

অদ্বৈত আনন্দে অধীর হয়ে হরিদাসকে আলিঙ্গন করলেন।

দীঘল হয়ে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের দুই পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সকলে হরিদাসকে তখন চিনতে পেরে লজ্জিত হলেন, অনুতপ্ত হলেন।

হরিদাসকে নিয়ে অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে নিজের বাড়ীতে চলে এলেন।

এই সময়ে নিমাই নবদ্বীপে প্রেমের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। প্রেমের সেই বন্যায় নবদ্বীপ ভেসে চলেছে। শান্তিপুরও ডুবুডুবু।

'সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদিয়া॥
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥' (শিবানন্দ)

পূর্বে বলেছি, হিন্দু সমাজের মধ্যে যখন চরম দুর্দিন দেখা দিয়েছে, দেশ যখন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে, জাতি যখন একেবারে ঝিমিয়ে, পিছিয়ে পড়েছে, তখন শুভ মুহূর্তে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে নিমাই-এর জন্ম হলো। সে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খ্রীঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে। রূপের তুলনা ছিল না তাঁর।

'শরত চান্দ জিনি গোরা মুখচান্দ।'

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিদ্যায় নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তরুণ বয়সেই নিমাই বিদ্যাসাগর একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হলেন। তাঁর খ্যাতি নবদ্বীপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। তিনি

ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। লতাগুল্মের দেশে তিনি ছিলেন বিরাটতম বনস্পতি।

একদিন নিমাই পিতার পিণ্ডদানের জন্যে গয়াধামে যান। সেখানে বিষ্ণুপাদ দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর সর্ব অঙ্গে জাগলো রোমাঞ্চ। ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো ওষ্ঠ। দুই চোখ বেয়ে অশ্রুর প্রবাহ ছুটলো।

ভাবাবেশ কেটে গেল।

তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সাধকপ্রবর বৈষ্ণবগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। মহাপুরুষকে দেখে নিমাই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

—প্রভু, আমায় দীক্ষা দিন।

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে এক নতুন জ্ঞানের উদয় হলো। এতকাল এত সযত্নে যে পুঁথিগত বিদ্যা, যে জ্ঞানলাভের জন্যে তিনি সাধনা করে এসেছেন, আজ তাঁর মনে হলো, সে ভার বই আর কিছুই নয়। তিনি বুঝতে পারলেন, ভক্তি বিনা সকল জ্ঞানই বৃথা।

নিমাই গয়া থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু এলেন আর এক নিমাই হয়ে। তাঁর সে চপলতা আর নেই। পাণ্ডিত্যের অভিমান দূর হয়েছে। কৃষ্ণ হয়ে পড়লেন তাঁর প্রাণসর্বস্ব। বিশ্বের বেদনায় নিমাই-এর অন্তর উচ্ছল হয়ে উঠলো। তখন থেকেই নিমাই-এর দুই চোখে অবিরল প্রেমের অশ্রু।

তিনি আর অধ্যাপনা করতে পারলেন না। ছাত্রদের বললেন, যখনই আমি তোমাদের পড়াতে আসি, তখনই মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি,

আজ তোমাদের ভালো করে পড়াবো। কিন্তু তখনই দেখি ‘কৃষ্ণ-বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।’ তাতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ ও অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। তাই আর পড়াতে পারি না।

একদিন সমস্ত পুঁথিপত্র ডোর দিয়ে বেঁধে গঙ্গার জলে তিনি ভাসিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতো তিনি বেরিয়ে পড়লেন মুক্ত পথে। মুখে শুধু একটি কথা—‘হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!’

জননী শচীদেবীর দুঃখের আর অবধি নেই—

‘গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হৈল॥’

জননীর প্রাণ! বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র! ঘরে নব-সুন্দরী যুবতী স্ত্রী!

নিমাই-এর চোখে জল দেখে জননী কাতর হলেন।

‘বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ, তোর দুঃখ কিসে॥’

উত্তর করেন শচীর দুলাল. মা, আমি কাঁদছি ভেবে দুঃখ পেয়ো না। আমি দেখলাম, পরমসুন্দর একটি শ্যামল শিশু বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন। তা দেখে আনন্দে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

নিমাই দিনরাত কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে রোদন করেন। কখনও বা আমার কৃষ্ণ নেই—এই মনের ক্লেশে ধুলায় গড়াগড়ি দেন। সোনার অঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হয়। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

কোথায় গেল সেই শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা! কোথায় গেল ন্যায়ের

চুলচেরা তর্কবিতর্ক! আর, কোথায় বা গেল নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে যশ আর প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা!

তেল বিনা যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি প্রাণ বিনা দেহ। নিমাই-এর মনে হলো, দেশে মানুষ আছে কিন্তু প্রাণ নেই! তিনি দেখলেন, দেশে বহু মন্দির রয়েছে, কিন্তু সে-সব মন্দিরে দেবতা নিদ্রিত। মন্দিরে মন্দিরে পূজারী রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মন্ত্র ভুলে গিয়েছেন। তিনি সংকল্প করলেন—দেশকে, জাতিকে, মানুষকে জাগিয়ে তুলবেন। এই ঘুমন্ত দেশে তিনি সমুদ্র মন্থন করে অমৃত বণ্টন করে চলবেন, কৃষ্ণনাম প্রচার করে বেড়াবেন।

তিনি দিনরাত কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্যে কৃষ্ণনাম কীর্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীবাস, মুকুন্দ, সদাশিব, গদাধর, মুরারি প্রভৃতি সে কীর্তনে নিয়মিত যোগ দিতে লাগলেন।

ফুল যখন ফুটে ওঠে, তখন কোথা হতে মধুর লোভে ভ্রমর এসে জোটে, কেউ তা বলতে পারে না। নিমাই-এর চরিত্র-সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতে লাগলো। দলে দলে ভক্তরা ছায়ার মতো তাঁর অনুগামী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। তাঁদের বিশ্বাস হলো, এই ধর্ম-বিমুখ যুগে নিমাই মানুষকে ধর্মে নতুন করে দীক্ষা দেবার জন্যে এসেছেন। সে বিশ্বাসের মূল কথা হলো যুক্তিতর্ক নয়, বিদ্যাবুদ্ধি নয়; একমাত্র প্রেম—অন্তরের গভীর প্রেম। যার অন্তরে সেই প্রেম জাগে সেই-ই ভগবানকে পায়, একান্ত করে পায়। সে প্রেম সীমাহীন, বাধাহীন। সে প্রেমের পরশও যে লাভ করে, তার অন্তরে কখনও নীচতা, বন্ধন, ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতা

এসব আসতে পারে না। বর্ণ, জাতি, আপাতধর্মের উর্ধ্বে সে প্রেম।
সে প্রেম বিশ্বজয়ী।

নিমাই সেই প্রেমকীর্তন শুরু করলেন। পথে পথে, ঘরে ঘরে, দুয়ারে দুয়ারে তিনি প্রেম বিলোতে বিলোতে চললেন। বিলোল সেই প্রেম-তরঙ্গে—

'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
সে প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥'

নীরস শুষ্ক জীবনে আবার প্রাণরসের উচ্ছল প্রবাহ ছুটলো। অনুরাগের স্পর্শে আবার নিদ্রিত প্রাণ জেগে উঠলো।

শাস্ত্র যা পারেনি, শিক্ষা যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিফল হয়েছে, এই সুন্দর-মূর্তি, তরুণ তাপস সেখানে তাই-ই স্পর্শমাত্র, দর্শনমাত্র সম্ভব করে তুললেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রেমের আহ্বানে একে একে দিকপালরা এসে নবদ্বীপে উদয় হতে লাগলেন। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি ভক্তরা আগেই জড়ো হয়েছেন। 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়' এসেছেন। অদ্বৈত প্রভুই তো গৌরাঙ্গসুন্দরকে আহ্বান করে এনেছেন। আমাদের হরিদাসও ছুটে এলেন।

'নাঙা মাথা গলায় কাঁথা ভ্রমি দেশ দেশ।'

হরিদাস নবদ্বীপে এলেন।

দূর হতে হরিদাসকে দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁকে সাদরে আহ্বান করলেন, এসো আমার প্রাণের হরিদাস! তাঁকে আলিঙ্গন করতে দু-বাহু বাড়ালেন।

হরিদাস দূরে সরে গেলেন। তিনি মনে করলেন, ঐ মহাপুরুষের তিনি স্পর্শেরও যোগ্য নন। তিনি অস্পৃশ্য, অধম।

হরিদাসকে বসতে আসন দেওয়া হলো। তিনি সেই আসনে বসলেন না। আসনখানি মাথার উপরে রেখে অত্যন্ত দীনভাবে নীরবে একান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুই চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে হরিদাস বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন—

'আজি হইতে মুঞি তোমার নাছের কুকুর।' (চৈ. ম.)

তিনি আরও প্রার্থনা করলেন—

'ভোজন পাত্রাবশেষ প্রভু দিবে একমুষ্টি।
তবে সে জানিব প্রভু আমি তোমার বটি॥ (চৈ. ম.)

অন্নের কাঙাল কুকুর যেমন গৃহস্থের সদর দরজায় পড়ে থাকে, আমিও তেমনি তোমার দরজায় এসে আশ্রয় নিলাম। প্রভু, তুমি পাতের উচ্ছিষ্ট দিয়ে আমাকে পালন করো।

সরল প্রাণের অকপট এমন দৈন্য আর কি শোনা যায়?

শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে অধীর হয়ে বললেন—

'নবদ্বীপের ভাগ্যে আইল শ্রীহরিদাস।'

হরিদাসকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে জননী শচীদেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন, মা, বহু ভাগ্যে শ্রীহরিদাসের মতো অতিথি মেলে।

জননী শচীদেবী ও পুত্র গৌরাঙ্গসুন্দর পরম যত্নের সঙ্গে হরিদাসকে ভোজন করালেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বহস্তে হরিদাসের গলায় দিলেন ফুলের মালা। বুকে লেপলেন চন্দন।

হরিদাস নবদ্বীপেই রয়ে গেলেন।

কিছুদিন বাদে ভক্ত শ্রীবাসের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুখট্টায় বসে ভাবাবেশে প্রায় সাত প্রহর কাল ছিলেন। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সবাইকে তিনি বললেন, তোমরা বর চাও। হরিদাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হরিদাসকে সম্বোধন করে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন, হরিদাস, তুমি কিছু প্রার্থনা করো।

হরিদাস কি আর চাইবেন? তিনি ভিক্ষা চাইলেন নিজ চরিত্রের দৈন্য। দৈন্য ছাড়া যে ভক্তি মেলে না।

হরিদাস বললেন, প্রভু, তুমি আমার গতি। তুমি দয়াল, আমার মতো পতিতকে তুমি দয়া কর। ভক্তবৎসল তুমি। কিন্তু আমি তো ভক্ত নই। তুমি দীনদয়াল, আমি কিন্তু দীন নই। অন্তর আমার এখনও অভিমানে পূর্ণ রয়েছে। তবুও তুমি অহেতুক দয়া করে থাক। সেই গুণেই আমাকে উদ্ধার করো, প্রভু!

শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন, হরিদাস, আমি তোমার দৈন্যে তোমার নিকট চিরঋণী। তুমি বর মাগো! বর মাগো! আমি তোমার সব দুঃখ মোচন করবো।

হরিদাস বললেন, প্রভু, যদি তুমি আরও কৃপা করতে চাও, তবে তাই-ই হোক্। কিন্তু বলতে আমার ভয় হয়, প্রভু। তবু তোমার আদেশেই বলি। অভিমান যেন কখনও আমার হৃদয়ে ঠাঁই না পায়। তুমি আমাকে দীন করো, দীনাতিদীন করো। তবেই আমি তোমার কৃপার উপযুক্ত হতে পারবো। প্রভু, যদি তুমি আমাকে বরই দেবে, তবে এই বর দাও, যেন তোমার ভক্তের উচ্ছিষ্ট হতে আমি কখনও

বঞ্চিত না হই। আর, আজ হতে নিয়ত তুমি আমাকে তোমার ভক্ত-ঘরের কুকুর করে রাখ। এর অধিক আমার আর কোনও প্রার্থনা নেই, প্রভু!

'তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
শচীর দুলাল বাপ কৃপা কর মোরে।
কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥' (চৈ. ভা.)

মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে সকলে জয়ধ্বনি করে উঠলেন—জয় শ্রীহরিদাস! জয় শ্রীশচীনন্দন!

শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের এই শুভদিনটি হরিদাসের অপূর্ব দৈন্যের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এই দৈন্যই হলো আবাল্য-তপস্বী হরিদাসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। নিজেকে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখা নয়, একেবারে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিলুপ্ত করে ফেলা! হরিদাস পরার্থে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তবে তিনি যে পরের হিতের জন্যে সামান্যতম কিছু করতেও সমর্থ, এ জ্ঞান তাঁর কোনও দিনই ছিল না।

মহাপ্রভুর কাছে এই যে আত্ম-নিবেদন করলেন, এইদিন থেকে মহাপ্রভু ছাড়া হরিদাস মৃত্যু পর্যন্ত আর কিছুই জানেননি। অহোরাত্র হরিনাম কীর্তন আর দিনে অন্তত একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করা—এই হলো এইদিন থেকে তাঁর নিত্য সাধনার বস্তু।

শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মহাসমুদ্রে হরিদাস চিরমগ্ন হয়ে রইলেন।

হরিদাসের ভাগবত দীপ্তি বর্ণনা করার সাধ্য নেই। এই ভাগবত দীপ্তিতে তিনি ধরণী রাঙিয়ে দিয়েছেন। বিস্ময়ের কথা এই, তিনি সর্বক্ষণ মনে করতেন, তিনি খদ্যোতের চেয়েও ক্ষুদ্রতর। তাঁর কোনও দীপ্তি নেই, দ্যুতি নেই, আভা-প্রভা-বিভা কিছুই নেই। ভগবানের দেওয়া তাঁর প্রাণটি নিয়ে কোনও রকমে তাঁরই সেবায় তিনি একান্ত নিভৃতে পড়ে আছেন মাত্র!'

আর, যেদিন তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে এই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে, সেদিন সেই প্রাণ তাঁরই শ্রীচরণে নিবেদন করে যেতে পারলেই তিনি ধন্য হবেন, কৃতকৃতার্থ হবেন! তিনি জানতেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, তিনি নিতান্তই কলুষিত, সর্ব গুণ-বিবর্জিত! তিনি জগতের একান্তই করুণার পাত্র! তিনি ভক্তজনের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুর মাত্র!

এমন দৈন্য! এ একেবারেই অচিন্তনীয়! অলৌকিক এই পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিমূলক দীনাতিদীনের ভাব—এই-ই শ্রীহরিদাসের জীবনে অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর! —এই-ই তাঁকে মহীয়ান করেছে!

—— ——

॥ ছয় ॥

হরিদাসের দিন আনন্দেই কাটতে লাগলো। প্রতিদিন তিনি তিন লক্ষ নাম জপ করেন। আর, অবসর পেলেই শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি মহাপুরুষের সঙ্গ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বড়ই স্নেহের পাত্র শ্রীহরিদাস।

শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন স্থির করলেন, তাঁরা সকলে মিলে অভিনয় করবেন। নিজের মেসোমশায় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের বাড়ীতেই অভিনয় হবে ঠিক হলো। জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব কবিরাজ এই দুই জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার পড়লো।

শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, নিতাই, শ্রীবাস প্রভৃতি সকলেই সে অভিনয়ে যোগ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধার চরিত্র, নিতাই বড়াই, গদাধর ললিতা, শ্রীবাস নারদ, অদ্বৈত কৃষ্ণ চরিত্র অভিনয় করলেন। হরিদাসও সে অভিনয়ে যোগ দিলেন। তিনি কোতোয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। পারিপার্শ্বিকের অভিনয় করেছিলেন মুকুন্দ।

সে অভিনয়ে জননী শচীদেবী, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেদিন হরিদাস সূত্রধরের চরিত্রও অভিনয় করেছিলেন।

প্রথমেই বাদ্য আরম্ভ হলো। পরে গায়কেরা রাধাকৃষ্ণের স্তবের দুটি শ্লোক পড়লেন।

স্তবগান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীহরিদাস সূত্রধররূপে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখে মস্ত গোঁফ, কাঁধে লাঠি। দু-হাতে কুন্দ ও মল্লিকা ফুলের গুচ্ছ। নয়নজলে তাঁর বক্ষ ভেসে যাচ্ছে।

তিনি এসেই শ্লোক পড়ে সেই ফুল দিয়ে রঙ্গভূমিকে পূজা করলেন। প্রণাম করে বললেন, ওগো রঙ্গভূমি, তুমি আজ বৃন্দাবনে পরিণত হও।

পূজা সাঙ্গ হলো। তিনি সভ্যগণকে বললেন, আজ আমি ভগবান ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলাম। দেখি, সেখানে দেবর্ষি নারদ বসে রয়েছেন। আমি ভগবান ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করলাম। তখন দেবর্ষি আমাকে একটি আজ্ঞা করলেন। তিনি বললেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁর বহুদিন হতে রয়েছে। নাটক আকারে সেই লীলা দেখাতে তিনি আমাকে আজ্ঞা করলেন।

এই বলে তিনি পাশেই পারিপার্শ্বিককে দেখতে পেলেন। তাঁকে বললেন, দেবর্ষির আদেশ শুনলে। এখন তার উদ্যোগ আয়োজন করো।

তখন দুইজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো।

তারপরে আসল অভিনয় শুরু হোলো।

সেদিনকার অভিনয় এত ভালো হয়েছিল, আর চরিত্রগুলিও এমন নিখুঁতভাবে অভিনীত হয়েছিল যে, জননী শচীদেবীরও চিনতে কষ্ট হয়েছিল, কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

হরিদাসের দিন এমনিভাবে সুখেই কাটতে লাগলো।

———

॥ সাত ॥

অদ্ভুত এই দেশ।

অন্য দেশে লোকে বিষয়-আশয়ের জন্যে পাগল হয়, বিদ্যার জন্যে পাগল হয়, রূপের জন্যে পাগল হয়, হিংসায় পাগল হয়।

এদেশে এসব তো আছেই। তা ছাড়া, ধর্মের জন্যে পাগলের সংখ্যা এদেশে যত, এত আর কোনও দেশে নেই। অদ্বৈত বুড়ো বয়সেও পাগলের মতো নাচতেন, গাইতেন, হুঙ্কার করতেন।—

'নাচে রে অদ্বৈত প্রভু সিংহের গর্জনে।'

হরিদাস নেচে নেচে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন।

'নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
* * *
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্ত সিংহ প্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হয়ে থাকেন পড়িয়া॥' (চৈ. ভা.)

কিন্তু সব পাগলের সেরা পাগল ছিলেন নিতাই—শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত। নিতাই-এর পাগলামি দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত।—

'গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই।
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায়।

নিতাই ও হরিদাস এই দুই পাগলকে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, প্রতি দিনকার ঘটনা সবই যেন তাঁকে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই জানানো হয়।

নিতাই ও হরিদাস—এ দুজনেরই বাহ্যজ্ঞান রহিত। হরিদাস বয়সে বড়, সাধারণত শান্তশিষ্ট, অনেকটা ধীর গম্ভীর। নিতাই বয়সে নবীন, উদাসীন আর স্বভাবত চঞ্চল-চূড়ামণি। হরিদাসের মাথা নেড়া, কৌপীন পরা, গায়ে ছেঁড়া কাথা। নিতাইচাঁদ কখনও বা নিতান্ত শিশুর মতো একেবারে দিগম্বর। তবে উভয়ই শিশুর মতো সরল ও অকপট। কোনও রকম আবিলতার গন্ধও তাঁদের মনে প্রাণে ছিল না।

উভয়ে নবদ্বীপে নামপ্রচারে নিযুক্ত।

হরিদাসের মুশকিল কিন্তু নিতাইকে নিয়ে। কিছুতেই নিতাইকে বাগে আনতে পারেন না। পথে চলতে প্রায়ই বড় বিপদে পড়েন। অথচ নামপ্রচার চাই-ই।

একদিন কথায় কথায় হরিদাস অদ্বৈত প্রভুকে বললেন—

'চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সেবা কোন দিকে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥

যদিও কুলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাইয়া ॥
তার পিতামাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লইয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়।
সেই সে করয়ে কর্ম, যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে ॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বুলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায়।

(নিত্যানন্দ চরিত—শ্রীবৃন্দাবন দাস)

হরিদাসের এই কথার মধ্যে কি ঝাঁঝ? অনুযোগ?—না মধু-বর্ষণ?

দুই সঙ্গীর এই চিত্র দেখলে আনন্দে মন ভরে ওঠে। মুখে হাসি ফোটে।

নিতাই আর হরিদাস প্রতিদিন নবদ্বীপে নাম প্রচার করেন। লোকে শোনে কি শোনে না, চায় কি চায় না, ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে, এসবে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

'নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'

এমন ভাবে এই দুজনা এসব কথা বলতেন যে, লোকের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত। চাউল দিলে তাঁরা নিতেন না। টাকা-

কড়ি তাঁরা স্পর্শ করতেন না। বলতেন, তোমরা কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণ নাম কর। এই আমাদের ভিক্ষা। প্রতিদিনই এইরূপ চলতো।

সারা নবদ্বীপ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

একদিন এই দুজনে দুই দুর্বৃত্তের কবলে পড়লেন। তারা হলো নবদ্বীপের জগাই আর মাধাই। তারা নবদ্বীপের রাজা বললেও চলে। অগাধ তাদের ধন-সম্পত্তি। পাঁড়-মাতাল তারা। নানারকম কুকাজে সব সময় তারা লিপ্ত থাকতো। চব্বিশ ঘণ্টাই চোখ থাকতো জবাফুলের মতো লাল। তাদের ভয়ে সারা নবদ্বীপ ছিল তটস্থ।

জগাই মাধাই-এর এক ভীষণ রোগ ছিল। তারা নেড়ামাথা বৈষ্ণব দেখলেই তাড়া করতো, ভয় দেখাতো।

একদিনের কথা বলি।—

সেদিনও জগাই মাধাই ঘোর মাতাল।

হঠাৎ নিতাই ও হরিদাস এই মাতাল দুজনের সামনে পড়ে গেলেন।

নিতাই আমুদে, চঞ্চল তো বটেই।

ওদের সামনে গিয়ে নিতাই জোরে কৃষ্ণ নাম করতে লাগলেন।

দেখাদেখি হরিদাসও বলছেন, বল কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ।

অমনি লাঠি নিয়ে দুই ভাই নিতাই আর হরিদাসকে তাড়া করলো।

নিতাই মজা করতে লাগলেন।

হরিদাস স্থূল, দৌড়াতে পারেন না। নিতাই ছল করে

পালাবার সময় হরিদাসের কৌপীন ধরে দৌড়াতে লাগলেন। নিষেধ করলেও ছাড়েন না। পেছনে তুই মাতাল লাঠি হাতে, সামনে পাগল নিতাই। যাহোক মাতাল তুজনে অধিক দূর দৌড়াতে পারলো না। কিছুদূরে গিয়েই পড়ে গেল। তখন নিতাই-এর মহা হৈ চৈ—কেন এমন পাষণ্ডের কাছে যাওয়া!

হরিদাসের মনের কথা—আপনিই তো আমাকে ওদের সামনে হাজির করালেন, শ্রীপাদ!

নিতাই-এর মনের অবস্থা হরিদাস জানতেন। নিতাই করুণার প্রতিমূর্তি।

হরিদাস বুঝলেন তুর্বৃত্তদের উদ্ধারের আর বড় বেশী বিলম্ব নেই।

নিতাই ও হরিদাস নিমাই-এর কাছে গিয়ে সব জানালেন। নিতাই বললেন, জগাই মাধাইকে উদ্ধার করতে হবে, প্রভু।

পরদিন যথারীতি আবার এঁরা তুজনে বেরিয়েছেন।

সেদিনও দেখা হলো জগাই ও মাধাইয়ের সঙ্গে।

নিতাইয়ের অবধূত বেশ দেখেই তারা ক্ষেপে গেল।

নিতাই বললেন, তোমরা কৃষ্ণনাম করো, কৃষ্ণনাম করো, ভাই।

তখন রেগে পাগলের মতো হয়ে মাধাই একখানা কলসীর ভাঙা কাণা ছুড়ে নিতাইকে আঘাত করলো। নিতাইয়ের কপাল কেটে রক্ত ছুটলো।

নিতাইয়ের কিন্তু সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বললেন

'মেরেছিস্ মেরিছিস্ তোরা
তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥' (চৈ. ভা.)

সকলে হায় হায় করতে লাগলেন।

কিন্তু 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়' বার বার বলতে লাগলেন—সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই। সে কথা শুনলে পাষাণও বোধ হয় গলে যায়। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ লোকজন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি নিতাইয়ের দুর্দশা দেখে কাতর হয়ে পড়লেন। নিতাই তাঁকে ক্রোধ করতে বার বার নিষেধ করতে লাগলেন।

জগাই, মাধাই অনুতপ্ত হলো। নিতাই-এর পা ধরে বার বাব তারা ক্ষমা চাইলো। নিতাই তো শুরুতেই ক্ষমা করেছেন। নিতাই-এর অনুরোধে সকলেই তাদের ক্ষমা করলেন।

তখন নিমাই জগাই ও মাধাইকে নিয়ে গঙ্গায় উপস্থিত হলেন। তাদের হাতে দেওয়া হলো তামা আর তুলসী।

নিমাই বললেন, মাধব, জগন্নাথ, তোমরা এ যাবৎ যত পাপ করেছ, তা তামা, তুলসী আর গঙ্গা-জলে উৎসর্গ করে আমাকে দান করো। আর, তোমরা আজ হতে নিষ্পাপ হও।

দুই ভাই-এর দুঃখের আর অন্ত নেই। সকলেই ঠাকুরকে ভালো ভালো জিনিস নিবেদন করে থাকে। আর, তারা কিনা তাদের জীবনের সমুদয় পাপ এই প্রেমের ঠাকুরকে উৎসর্গ করবে! তাদের কান্না আর থামে না। নিমাই-এর বার বার অনুরোধে তারা সজল চোখে রাজী হলো।

তখন নিমাই বললেন—আমি তোমাদের সমস্ত পাপ সানন্দে নিলাম। আজ হতে তোমরা নিষ্পাপ।

সকলে 'হরি হরি' বলে উঠলেন।

জগাই, মাধাই এর পরে সব ছেড়ে দীন ভিখারীর মতো গঙ্গার ঘাটে পড়ে থাকতো। প্রতি লোকের পা ধরে তারা ক্ষমা চাইতো। তাদের চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অবিরাম জল গড়িয়ে পড়তো। এখনও নবদ্বীপের গঙ্গায় মাধাই-এর ঘাট রয়েছে।

জগাই, মাধাই উদ্ধারের কাহিনী আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। এই উদ্ধারের মূলে ছিলেন নিতাই আর হরিদাস।

আর একদিনের কথা বলি।

নদীয়ার কাজীর নাম চাঁদ কাজী। তিনি ছিলেন সম্পর্কে হুসেন শাহের একরকম নাতি। তাই তাঁর প্রবল প্রতাপ। আগে বলেছি, নিমাই দলবল নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতেন। প্রথম প্রথম কাজী তাতে বাধা দেননি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নবদ্বীপের একদল মুসলমান গিয়ে কাজীর কাছে নিমাই-এর বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। কয়েকজন নাম-করা হিন্দুও তাঁর কাছে গিয়ে বললেন

'গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জন॥'

এর ফলে চাঁদ কাজী নিমাই-এর উপরে খুব রেগে গেলেন একদিন

'ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইলা।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিলা॥
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি॥

কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি মুঞি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥' (চৈ. চ.)

—ভয়ানক কথা! স্বয়ং কাজীর আদেশ! শুধু আদেশ নয়! জাতি নষ্টের ভয়! সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকী!

চাঁদ কাজীর এ হেন অসঙ্গত আদেশ শুনে নবদ্বীপের বহু লোক ভয় পেয়ে গেল। ফলে

'আথে ব্যাথে পলাইল নাগরিয়াগণ।' (চৈ. চ.)

কাজীর এই অন্যায় আর অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি ঠিক করলেন, এ হতেই পারে না। ব্যক্তিগত ধর্ম আচরণে কেউ বাধা দিতে পারে না। স্বয়ং সম্রাটেরও সে ক্ষমতা নেই। তিনি সংকল্প করলেন, তিনি কাজীর আদেশ অমান্য করবেন। ফল যাই-ই হোক না কেন। আর, অমান্য করবেন শুধু তিনি নিজে নন। অমান্য করবে নদীয়ার সকল লোক একত্রে, সমবেতভাবে। যাদের মনোবল গিয়েছে ভেঙে, যারা একান্ত ভীত হয়ে পড়েছে, তারা সকলেই এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। এইভাবে তিনি সকলের মনোবল ফিরিয়ে আনবেন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ এক অভিনব উপায় বের করলেন। জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

'তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে
দেখি কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥' (চৈ. চ.)

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে ডেকে বললেন, শ্রীপাদ, শীঘ্রই সর্বত্র ঘোষণা করুন, আজ সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্তন করবো। আহারাদি করে সকলকে বিকালে আমার বাড়ীতে আসতে বলুন। আরও বলুন, প্রত্যেকেই যেন একটি করে দীপ নিয়ে আসেন। নাগরিয়াগণকে বলুন, তাঁরা যেন ভয় না করেন। নির্ভয়ে তাঁরা কীর্তন করুন।

বিরাট নগর-সংকীর্তনের আয়োজন করা হলো।

তখনকাব নবদ্বীপ খুব বড় শহর ছিল। সারা শহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। লোকেরা নানারকম সাজগোজ করতে লাগলো। নিমাই কোন্ পথে যাবেন ঠিক নেই। কাজেই সকলে নিজ নিজ বাড়ী আলোকিত করার আয়োজন করলো। মেয়েরা খই, কড়ি, বাতাসা যোগাড় করলেন। যোগাড় করলেন অসংখ্য ফুল। তাঁরা নিজেরাও সাজলেন।

'কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে ॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥' (চৈ. চ.)

আসল কথা, সারা নবদ্বীপ আলোকিত ও উৎসবমুখর হয়ে

উঠলো। যাঁরা কীর্তনে চললেন, তাঁদের গলায় ফুলের মালা, সর্ব অঙ্গ চন্দনে চর্চিত। সকলেরই হাতে একটি করে দেউটি। কটিতে তেলেব ভাঁড় বাঁধা। বাপ নিলেন একটি। ছেলেও নিলেন।

'বাপ বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।'

কেউ চাকরদের দিয়েও নিলেন। আবার

'যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়।' (চৈ. চৈ.)

এমনি করে অসংখ্য লোক সেদিন বিকালে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারে সমবেত হলেন। আর, মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে অপূর্ব সাজে সজ্জিত হলেন। তাঁকে দেখে অবাক হযে লোকে বলাবলি কবতে লাগলো

'ভূতলে কি উদল চাঁদ ?'

অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে গলায় ফুলের মালা পরে শ্রীগৌরাঙ্গ জনতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তখন সেই উদ্বেল জনসমুদ্র থেকে অবিরাম হরিধ্বনি উঠতে লাগলো। সারা নবদ্বীপ যেন কেঁপে উঠলো।

'পরে হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ॥
হুহুঙ্কার শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিলা সকল॥' (চৈ. চ.)

সংকীর্তন শুরু হলো। অসংখ্য খোল, করতাল, শাঁখ! অসংখ্য লোকের কীর্তন! অসংখ্য জলন্ত দীপ! রাজপথ আলোয় আলোকিত!

প্রতি গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত! সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সারা নবদ্বীপ নতুন এক ধরনের উৎসবে মেতে উঠলো। নবদ্বীপের প্রতি গৃহ থেকেই যেন লোক এসে সে সংকীর্তনে যোগ দিল। গৃহের ছাদেও যেন লোক ধরে না। এত বড় শোভাযাত্রা, আর এমন অপূর্ব শোভাযাত্রা এর আগে আর কেউ কখনো দেখেনি। রাজাদেশ অমান্য করে জ্বলন্ত আলোক নিয়ে অসংখ্য লোকের রাজপথের উপর দিয়ে শোভাযাত্রা করে চলা জগতের ইতিহাসে এই প্রথম!

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বিশাল জনতাকে তিন সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন।

'এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করেন হরিদাস।
মধ্যে নাচেন আচার্য গোসাঞী পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করেন গৌরচন্দ্র।
তার সঙ্গে নাচে চলে প্রভু নিত্যানন্দ॥' (চৈ. চ.)

সকলে কীর্তন করতে করতে চললেন। কেহ গাইছেন, 'হরি হরয়ে নমঃ...', কেহ গাইছেন, 'তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে, হে সারঙ্গধর!...প্রভৃতি।

সকলে নেচে নেচে গাইতে গাইতে চলেছেন। নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গও। অপূর্ব উন্মাদনায় যে কোনদিন গায়নি, সেও গাইতে লাগলো।

'মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়, সেও হইল গায়ন॥' (চৈ. চ.)

যে বাড়ীর পাশ দিয়ে শোভাযাত্রা যেতে লাগলো, সেই বাড়ীর ছাদ থেকে, দরজা থেকে অসংখ্য ফুল, খই বৃষ্টি হতে লাগলো। নবদ্বীপের রাজপথ ফুলে ফুলময় হয়ে পড়লো। আর, সেই ফুলময় পথের উপব দিয়ে নেচে গেয়ে সেই শোভাযাত্রা চলতে লাগলো। জনতার আনন্দ আর ধরে না! নবদ্বীপ টলমল করতে লাগলো।

'কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায়, আপনা পাসরি॥
কেহ কেহ নানামত বাদ্য গায় মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কার সনে॥ (চৈ. চ.)

এইভাবে উৎসব-মত্ত হয়ে অসংখ্য লোকে নবদ্বীপের রাজপথ দিয়ে গান করে বেড়াতে লাগলো। সকলের আগে, সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রইলেন শ্রীহরিদাস। তিনি সবাইকে নাচিয়ে, রাঙিয়ে, মাতিয়ে চললেন।

কাজীর দল এই বিশাল জনসমুদ্রের মুখোমুখি হতে সাহস করলো না। কাজী তো নিতান্ত ভীত হয়ে বাড়ীর অন্দরমহলে লুকিয়ে রইলেন। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের আহ্বানে তাঁর কাছে এলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে নানা কথা বললেন। নানা উপদেশ দিলেন। কাজী তখন

* * * *

'প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয় বাণী।'

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কহে এক দান মাগি যে তোমায়।
সংকীর্তন বাধ যেন নহে নদীয়ায়॥
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি করিল আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥' (চৈ. চ.)

এইরূপে এদেশের প্রথম রাজাদেশ প্রতিবাদ করা, সমবেতভাবে অমান্য করা জয়যুক্ত হলো। নবদ্বীপের রাজপথ দিয়ে অবাধে কীর্তন করে বেড়ানো অব্যাহত রইলো।

জাতির মনোবলকে ফিরিয়ে আনতে, শক্তিশালী শাসকের অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে ও শোভাযাত্রা করে সে আদেশ অমান্য করা, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই জন্যে এই ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। আর, এও স্মরণে রাখতে হবে, সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন শ্রীহরিদাস।

নবদ্বীপের পাশে কাজীর ভিটা এখনও রয়েছে।

শোভাযাত্রার পরে নিমাই দরিদ্র থোড়বেচা শ্রীধরের কুঁড়ে-ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁর দরজার পাশে যে জলপাত্র ছিল সেখান হতে জলপাত্র উঠিয়ে জলপান করলেন।

শ্রীধর কাতরভাবে বারংবার নিষেধ করেছিলেন। নিমাই সে নিষেধ শুনলেন না। শ্রীধর সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। নিমাই তাঁকে হাত দিয়ে চেতন করলেন। গভীর তৃপ্তিতে

'প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর'

॥ আট ॥

বিচিত্র আমাদের দেশ! বিচিত্র আমাদের লোকজন! এই দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধি হওয়া বড় সহজ কথা নয়। এদেশের প্রতিনিধি হতে গেলে, জনসাধারণকে প্রাণের বাণী শোনাতে গেলে, জনসাধারণের মতো হয়ে তাদের একেবারে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। বিষয়-আশয়, আপন বলতে যা কিছু, প্রিয় বলতে যা কিছু, সব বিলিয়ে দিয়ে তবেই জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়ানো যায়, জনসাধারণের প্রতিনিধি হওয়া যায়। তবেই তাঁর কথা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। অতীতেও এমনটি ছিল। এখনও তাই-ই চলছে। সর্বস্ব বলতে যা বুঝায়, তা নিঃশেষে বিলিয়ে না দিলে, একেবারে ভিখারী না হলে জনতার হৃদয়ে তাঁর ঠাঁই মেলে না। রামচন্দ্র, অশোক, হর্ষবর্ধন, শিবাজী থেকে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত—সেই একই ধারা চলেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেখলেন, তাঁরও সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হবে। এমন কি স্ত্রী-পুত্র, সাধের নবদ্বীপ, প্রিয় ভাগীরথী, আপন বলতে যত কিছু—সবই তাঁকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে। তবেই তাঁর প্রেমের বাণী তিনি প্রতি লোকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারবেন।

তিনি সন্ন্যাসী হবেন সংকল্প করলেন।

একদিন রাত্রে নিঃশব্দে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। মাথার চাঁচর

কেশ মুণ্ডন করলেন। ডোর কৌপীন পরলেন। হাতে দণ্ড নিলেন। সেদিন থেকে নাম হলো তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি অনুরাগী ভক্তেরা তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে।

অদ্বৈতের গৃহে সেদিন মহোৎসব। নবদ্বীপ ভেঙে পড়লো সেখানে। সেখানে লোকে লোকারণ্য। শান্তিপুরের সবাই সেখানে জড়ো।

অদ্বৈত ভাণ্ডার শূন্য করে সবাইকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। সেদিন সেখানে নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-ভক্তেরা সবাই উপস্থিত।

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে একসঙ্গে বসিয়ে ভোজন করাতে গেলেন।

'দুই ভাই আইল তবে করিতে ভোজন।'

তখন শ্রীচৈতন্য মুকুন্দ ও হরিদাসকে ডাকলেন॥

'মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
জোড় হাতে দুই জনে কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে—মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥' (চৈ. চ.)

* * *

দুই প্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভোজন করলেন।

আহার শেষ হলে অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের পাদসম্বাহন করতে এগিয়ে গেলেন।

তখন

* * *

'সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন।
বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥
তবে ত আচার্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥ (চৈ. চ.)

হরিদাস ও মুকুন্দ শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে একসাথে ভোজন করলেন।

রাত্রে শুরু হলো সংকীর্তন। অদ্বৈত আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। যেন বেহুঁশ অবস্থা তাঁর। নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে রক্ষা করতে লাগলেন। অদ্বৈতের সে উদ্দাম নৃত্য দেখে

'হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা।'

হরিদাসও নৃত্য শুরু করলেন।

প্রভু অদ্বৈত গান ধরলেন

'কি কহিব রে সখি আজক আনন্দ ওর!
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥'

এই গান শুনে

'ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।'

মহাপ্রভু জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলেন।

তখন মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে অপূর্ব-কণ্ঠ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া মুকুন্দ গান ধরলেন

'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনুমন জ্বরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাঙ॥'

এই গান শুনে

'আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন'

তারপরে

'বোল বোল বুলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া॥'

এমনিধারা ভোজন কীর্তন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ক্রমাগত দশদিন যাবৎ চললো।

শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্যসঙ্গ সুখ এই দশদিন আকণ্ঠ পান করলেন।

সন্ন্যাসীর গৃহে থাকবার বিধি নেই।

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য থাকবেন কোথায়?

সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, তিনি থাকবেন নীলাচলে। জননী শচীদেবীরও তাতে সম্মতি মিললো।

উড়িষ্যার রাজা তখন প্রতাপরুদ্র। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রান্ত। তাঁর রাজ্য মধ্যে মুসলমানের প্রবেশ অধিকার নেই।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে রওনা হবার উদ্যোগ করছেন। হরিদাস এসে চরণে প্রণত হলেন। তিনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর যে সঙ্গে যাওয়া হবে না! 'হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন'

'নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর, নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন।
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥'

হরিদাসের বিলাপ শুনে মহাপ্রভুব চোখ ছলছল করতে লাগলো।

'প্রভু কহে, কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥'

মায়ের চোখের জলে, স্ত্রীর আকুল আর্তনাদে যিনি কাতর হননি, তিনি আজ হরিদাসের আর্তিতে অস্থির হয়ে পড়লেন।

কোনও প্রকারে হরিদাসকে আশ্বস্ত করে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে রওনা হলেন।

যাবার সময়ে একান্তে হরিদাসকে বললেন, তোমার মতো ব্যাকুলতা নিয়ে আমি যেন শ্রীজগন্নাথের চরণপ্রান্তে পৌঁছতে পারি, হরিদাস।

শ্রীচৈতন্য পুরীধামে রওনা হলেন। নবদ্বীপ আঁধার হয়ে পড়লো। নবদ্বীপচন্দ্রের বিহনে 'গোরা বিনা শূন্য ভেল নদীয়া নগরী।'

নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হায় হায় করতে লাগলো।

'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে।'

যে যাকে সামনে পায় তাকেই বলে

'ছাদে গো নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া চান্দ গোরারে ফিরাও॥'

গোরাচাঁদকে কেউ ফিরাতে পারলো না। নবদ্বীপ শোকে উন্মত্ত হলো।

নিতাই, মুকুন্দ, গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন অনুরক্ত ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে রওনা হলেন।

পথে কিছুদূর এগিয়ে তিনি নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীপাদ, এই দীর্ঘ পথের জন্যে আপনারা কে কি সম্বল এনেছেন, আর কেই বা কি দিলেন।

ভক্তরা শ্রীচৈতন্যকে জানতেন।

তাঁরাও তেমনিই রিক্ত হয়ে তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন, পথের ভাবনা ছেড়ে দিয়েই তো তোমার সঙ্গে চলেছি, প্রভু। আমরা এক কপর্দকও সঙ্গে আনিনি। আমাদের

সম্বলের মধ্যে দণ্ড, কৌপীন, বহির্বাস এবং ছেঁড়া কাঁথা। বললেন, তোমার আজ্ঞা ছাড়া সম্বল আনতে সাহস হবে কেন, প্রভু?

শ্রীচৈতন্যের চিত্ত প্রসন্ন হলো। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, সাধু!

যে পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্য চললেন, সেই পথের দু-ধারে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এলো।

শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তন করতে করতে পথ দিয়ে চলছিলেন। তার ফলে পথের দু-ধারে এক নতুন ভাবের প্লাবন এলো। এমনি-ভাবে পথে পথে পায়ে হেঁটে নাম-কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে এসে উপস্থিত হলেন। সে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের কথা।

নবদ্বীপ আঁধার হলো। কিন্তু আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো নীলাচল।

সেই সময়ে নীলাচলে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করতেন। তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সেই অনুরাগসর্বস্ব নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে তাঁরা যখন বুঝলেন যে, শ্রীচৈতন্য সর্বজ্ঞান আয়ত্ত করেই জ্ঞানাতীত ভক্তিপথে এসে পৌছেছেন, তখন তাঁরাও সমস্ত জ্ঞানের মোহ ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নাম-সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। তাঁর অনুরক্ত হলেন। নীলাচলে সেখানকার রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর শিষ্য হলেন। বাসুদেব তখন ভারতেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সার্বভৌম বিজয়-কাহিনী সকলেরই জানা আছে। অল্পকালের মধ্যে মহারাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর চরণপ্রান্তে রাজদণ্ড রাখলেন।

পর বৎসর বৈশাখ মাসে শ্রীচৈতন্য একজন মাত্র প্রিয় সঙ্গী নিয়ে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান। প্রেমের সেই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি রায় রামানন্দকে আপন করে আনলেন।

রায় রামানন্দ একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বড় কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, পণ্ডিত ও ভক্ত। তিনি প্রতাপরুদ্রের একজন বড কর্মচারী ছিলেন। উত্তরকালে রায় রামানন্দ সকল বিষয়-আশয় ছেড়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হয়েছিলেন।

তারপরে তিনি আরও দক্ষিণে গেলেন। পথে যেখানে যত সাধু ও পণ্ডিত ছিলেন, একে একে সকলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এসে সেই নবধর্মে অনুরাগী হয়ে উঠলেন।

এইভাবে এক প্রদীপ থেকে হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠলো।

প্রায় সারা দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করে বৎসরের শেষ দিকে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরে এলেন।

নীলাচলে পৌঁছে গৌড়ের ভক্তগণকে সাদর আহ্বান জানালেন শ্রীচৈতন্য। তাঁদেরও ব্যাকুলতার অবধি ছিল না তাঁদের প্রিয়তমকে দেখতে।

এবার হরিদাসের ডাক পড়লো।

প্রভু অদ্বৈতকে অগ্রণী করে সারা পথ নাম-কীর্তন করতে করতে গৌড়বাসী চৈতন্যভক্তগণ নীলাচলে এলেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্র তাঁদের অভ্যর্থনার যথোচিত আয়োজন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য একে একে সবাইকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু

হরিদাসকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সকলে এলে, আমার হরিদাস কোথায় ? কাঁহা হরিদাস ?

হরিদাস তখন দূরে রাজপথের পরে দণ্ডবৎ হয়ে অঝোরে কাঁদছেন। তখন

'ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে' (চৈ. চ.)

ভক্তরা তাঁকে কত অনুনয় করলেন। তিনি গেলেন না। তিনি নীচ, সেই জন্যে। তিনি শ্রীমন্দিরে যাবার অধিকারী নন।

'হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে তোটা মধ্যে স্থান যদি পাই।
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একেলা কাল গোঞাই॥
জগন্নাথ সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রঁহো, মোর এই বাঞ্ছা হয়॥' (চৈ. চ.)

সকলে গিয়ে হরিদাসের কথা শ্রীচৈতন্যকে জানালেন। হরিদাসের কথা শুনে শ্রীচৈতন্যের মনে বড় আনন্দ হলো। তিনি রাজকর্মচারী গোপীনাথকে ডেকে বললেন

'আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥' (চৈ. চ.)

গোপীনাথ বললেন, প্রভু, সব ঘরই আপনার। যা করতে হয়, যা যা প্রয়োজন, সবই করুন, সবই গ্রহণ করুন।

সকল ভক্তজনের বাসা ঠিক করে, সকলকে নিজের কাছে খাবার নিমন্ত্রণ করে

'তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।'

হরিদাস তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে দুই হাতে তুলে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

হরিদাস বললেন, প্রভু, আমি অস্পৃশ্য, পামর। আমাকে তুমি স্পর্শ করো না।

শ্রীচৈতন্য বললেন, হরিদাস, আমি নিজে পবিত্র হবার লোভেই তোমাকে স্পর্শ করি। তোমার পবিত্রতা আমাতে নেই, হরিদাস।

'প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থ স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥' (চৈ. চ.)

সত্যিই তো, যে ভক্ত একমনে নিয়ত ভগবানকে ডাকেন, তাঁর জন্যে ব্যাকুল হন, তীর্থস্নান বা দান যজ্ঞাদির কোনও ফল পেতে তাঁর কি বাকি থাকে? তিনি যে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো পরম পবিত্র! তিনি চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর আবার জাতি দোষ?

প্রভু শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করলেন।

তখন দুইজনেরই নয়ন দিয়ে অঝোরে নয়নাশ্রু পড়তে লাগলো। অশ্রুজলে অশ্রুজল গেল মিশে। বক্ষে বক্ষে মিলন হলো। ভূমি গড়িয়ে দুজনের মিলিত নয়নাশ্রুধারার স্রোত বয়ে চললো।

'দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্যগুণে॥' (চৈ. চ.)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বহুবার বহুভাবে এমনিধারাই বলেছেন যে, হরিদাসের জন্ম পরিগ্রহে সারা পৃথিবী পবিত্র হয়েছে, ধন্য হয়েছে। হরিদাস নিজেকে অপবিত্র মনে করলেও মহাপ্রভু জানতেন, হরিদাসের অপ্রাকৃত ভক্তদেহ থেকে পবিত্রতর কোনও বস্তু পৃথিবীতে আর নেই।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে পুষ্পোদ্যানে নিয়ে গেলেন। আর, তার এক কোণে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। বললেন, হরিদাস, তুমি এখানে থেকেই তোমার জপ-সাধনা করো। যখন শ্রীমন্দিরে যেতে তোমার এতই সংকোচ, তখন তুমি শ্রীমন্দিরে যেও না। এখান থেকেই শ্রীমন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করো। আমি রোজ এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমার জন্যে প্রসাদান্ন এখানেই রোজ আসবে।

'এইস্থানে রহি, কর নাম-সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঁই আসিবে তোমার প্রসাদান্ন॥' (চৈ. চ.)

হরিদাস সবই পেলেন। কী আর বাকি রইলো ?

কাশী মিশ্রের এই পুষ্পোদ্যানের মধ্যে যেখানে হরিদাসের কুটীর, ঠিক তারই পাশে একটি বকুল গাছ ছিল। সেই বকুল গাছটি এখনও রয়েছে। এর ভিতরে কাঠ নেই বললেই চলে। বাইরে ছাল বা ত্বকমাত্র অবশিষ্ট আছে। এরই নাম সিদ্ধ বকুল।

হরিদাসের বয়স এখন বাষট্টি। তিনি প্রভু অদ্বৈত ছাড়া আর সকলেরই বড়। বেশী স্থূলকায় বলে চলাচল করা তাঁর পক্ষে কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি ভজন-কুটীর হতে বড় বেশী আর বের হন না। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সকলেই তাঁর কাছে তাঁর কুটীরে নিত্য আসেন।

'নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ॥' (চৈ. চ.)

শ্রীচৈতন্য মন্দির দর্শনের পর প্রতিদিন তাঁকে দেখা দিয়ে যেতেন। হরিদাসকে বেশীক্ষণ দেখতে না পেলে মহাপ্রভু যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়তেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তন করতেন। সেখানে হরিদাস যেতেন না। কোনও দিন শ্রীচৈতন্যের বাসায় নাম-কীর্তন হলে সেখানে হরিদাসের ডাক পড়তো। হরিদাস অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে দীনাতিদীনের মতো সেখানে যেতেন। সেখানে সকল ভক্ত মিলে প্রসাদ ভোজনের মহোৎসব চলতো।

একদিন

'উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।'

তখন

'হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘন ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্ত সঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দেবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে॥' (চৈ. চ.)

তারপরে

'প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লৈঞা॥' (চৈ. চ.)

এমনিভাবেই হরিদাসের দিন কাটতে লাগলো।

দেখতে দেখতে এসে পড়লো রথযাত্রা উৎসব। পুরীধামে রথযাত্রার সময় মহা ধূমধাম হয়ে থাকে। এ ধূমধামের প্রথম আয়োজন করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেবার তিনি সকলকে নিয়ে রথের আগে সংকীর্তন ও নৃত্য করতে করতে চললেন। সেবার যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি আর কোনও বারই হয়নি। সমগ্র নীলাচল যেন মেতে উঠেছিল। রথযাত্রার পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু হরিদাস পুরীধামেই রয়ে গেলেন।

শ্রীচৈতন্য সকলকে বলে দিলেন

'প্রত্যব্দে আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে।'

ঠিক এমনিধারা প্রতি বছরই রথের আগে গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীধামে আসতেন। দ্বিতীয় বছরে রথের পরে শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে

শান্তিপুরে নিয়ে গেলেন। হরিদাস সাত আট মাস শান্তিপুরে অবস্থান করলেন। তৃতীয় বছরে আবার তিনি নীলাচলে এলেন। এই সময় বাসুদেব সার্বভৌম কাশীধামে যাচ্ছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁব মতো বড পণ্ডিত সেকালে ভারতে খুবই কম ছিল। তিনি আগেই শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হয়েছেন। পথে বাসুদেবের সাথে গৌড়ীয় ভক্ত-গণের মিলন হলো। বাসুদেব অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে যথারীতি নমস্কার কবলেন। শেষে শ্রীহবিদাসেব কাছে এলেন। তাঁকে দেখেই 'কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ' বলে তিনি নমস্কাব করলেন।

জাতিকুলের অপেক্ষা না করে, শ্রীপাদ হরিদাস, আপনাকে নমস্কার করি।

১৪৩৫ শকের বিজয়া-দশমীর দিন শ্রীচৈতন্য গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করলেন। হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকও বৃন্দাবনে চললো। অসংখ্য লোক। সকলেই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হতে চায়।

গৌড়ের পাশেই রামকেলি গ্রাম। রামকেলি গ্রামে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের বাস। তাঁবা দু-ভাই গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের অমাত্য ছিলেন। সনাতন ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, রূপ ছিলেন একান্ত সচিব। তাঁদের প্রতিপত্তি ছিল অগাধ। আরও অগাধ ছিল তাঁদের ধন-সম্পত্তি। দুজনেই বড় পণ্ডিত। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।

শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলি গ্রামে এলেন, তখন দু-ভাই রূপ ও সনাতন যুক্তি করে ঠিক করলেন—না, আর রাজ-সরকারে কাজ করা চলবে না। তাঁরা শ্রীচৈতন্যের পায়ে আত্মসমর্পণ করবেন।

'ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্ধরাত্রে দুই ভাই আসিল প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তাঁহা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহেন—উঠ, উঠ! হইল মঙ্গল॥' (চৈ. চ.)

এই দুজনের নানারকম আর্তি শুনে তিনি আরও বললেন

'শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস।
ওঠ দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হইতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥'

এই দুই ভাই উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অসংখ্য লোক বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। তা দেখে সনাতন প্রভুকে নিভৃতে বললেন

'যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটি॥' (চৈ. চ.)

শ্রীচৈতন্য বুঝলেন, সনাতন ঠিক কথাই বলেছেন। দেবস্থানে

সঙ্গোপনে যাওয়াই সঙ্গত। তিনি বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত করে শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সেখানে এসে মিললেন শ্রীরঘুনাথ। এই রঘুনাথের কথা আগে বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য পাঁচ-সাত দিন শান্তিপুরে অবস্থান করে, শেষে বরাবরের জন্যে শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়ে থেকে কৃষ্ণনাম প্রচারের নির্দেশ দিয়ে, হরিদাস প্রভৃতিকে নিয়ে নীলাচলে ফিরে এলেন।

এবার হরিদাস পুরীতে এসে ভজন-কুটীরে স্থায়ীভাবে বাস করেন। পরবর্তী বার বছরে তিনি পুরীধাম ত্যাগ করেননি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের নিত্য সঙ্গলাভ করে কৃতার্থ হন।

———

॥ নয় ॥

পর বছর শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। তিনি যাত্রা করলেন ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়ে। ফিরবার পথে প্রয়াগে শ্রীরূপ ও তাঁর আর এক ভাই শ্রীঅনুপম এবং কাশীধামে শ্রীসনাতনের সঙ্গে তাঁর মিলন হলো। ১৪৩৭ শকের শেষভাগে তিনি পুরীধামে ফিরে এলেন। সেই থেকে আঠারো বছর যাবৎ তিনি নীলাচল ছেড়ে আর কোথাও যাননি।

হরিদাস এই সময় কঠোর সাধনায় মগ্ন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি জপে নিযুক্ত থাকতেন।

প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ প্রতিদিন তাঁর জন্যে প্রসাদান্ন নিয়ে আসতেন।

প্রতি সকালে শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে উপলভোগ দেখে হরিদাসের কাছে আসতেন। সেখান হতে সমুদ্রে স্নান করে মধ্যাহ্নে তিনি ঘরে ফিরতেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে দেখলেই হরিদাস বিভোর হয়ে যেতেন। দণ্ডবৎ হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তেন। তাঁকে আসনে বসিয়ে তবে নিজে বসতেন।

শ্রীচৈতন্য তখন জোর করে তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করতেন। তাঁর সকল শরীরে জাগতো রোমাঞ্চ। হরিদাসের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো।

হরিদাসকে পেয়ে শ্রীচৈতন্য আত্মহারা হতেন। আনন্দে কত

কথা কইতেন! নিজে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েও হরিদাসের কাছে তিনি নানা তত্ত্ববিচার চাইতেন। হরিদাস বালকের মতো সরল ভাষায় সহজ করে তা সমাধান করতেন। তাতে পাণ্ডিত্যের গন্ধও থাকতো না।

একদিনের কথা।—

শ্রীচৈতন্য হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হরিদাস, কলিকালে মুসলমানরা গো-ব্রাহ্মণের হিংসা করে। তাদের কি গতি হবে?

হরিদাস উত্তর করলেন, প্রভু, তাঁরা খাদ্যাখাদ্য বিচারের সময় প্রায়ই হারাম হারাম বলে থাকেন। রাম নামের গুণেই তাঁরা উদ্ধার পাবেন, প্রভু। ঘোর পাপী অজামিল নিজের ছেলে নারায়ণের নাম ডাকতে ডাকতে উদ্ধার হয়ে গিয়েছিলেন।

১৪৩৮ শকে রথযাত্রার আগে শ্রীরূপ নীলাচলে এলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ স্বধর্মচ্যুত হয়ে আচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন। নীলাচলে এসে তিনি হরিদাসের কুটীরে আশ্রয় নিলেন। সে সময়ে

'হরিদাস ঠাকুর তারে বড় কৃপা কৈল।'

শ্রীচৈতন্য যথারীতি হরিদাসের ভজন-কুটীরে এলে হরিদাসই শ্রীরূপকে দেখিয়ে দেন। হরিদাসের কুটীরেই শ্রীচৈতন্য রথযাত্রা থেকে দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল শ্রীরূপকে নানা শিক্ষা দিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। কালে, শ্রীরূপ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে শ্রীসনাতনকে নীলাচলে পাঠিয়ে দিতে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে নির্দেশ দিলেন।

শ্রীসনাতন এলেন। তিনি এলেন দীনাতিদীন কাঙালের মতো ঝাড়খণ্ডের বনপথে উপোস করতে করতে। পথে তাঁর সকল দেহে ভীষণ কণ্ডু দেখা দিল। তাঁর সকল শরীর দিয়ে সব সময় রস গড়িয়ে পড়তো। সনাতনের ভীষণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো।

তাঁর ধারণা হলো বুঝিবা তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ধারণা হলো, তিনি ব্যভিচারী, জগন্নাথের শ্রীমন্দির দেখবার তিনি অধিকারী নন। মনে মনে ঠিক করলেন, যখন রথ বের হবে, তিনি রথের চাকার নিচে পড়ে একদিন দেহত্যাগ করবেন।

পুরীধামে পৌঁছে খুঁজতে খুঁজতে সনাতন এলেন হরিদাসের ভজন-কুটীরে। শ্রীসনাতনকে দেখেই হরিদাস তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

'হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ বন্দন।
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥' (চৈ. চ.)

সনাতনের মতো শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হরিদাসের চরণে প্রণত হলেন।

প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের কুটীরে এলেন। হরিদাস ও সনাতন উভয়ে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করলেন।

হরিদাস নিবেদন করলেন, প্রভু, শ্রীপাদ সনাতন আপনাকে প্রণাম করছেন।

অমনি শ্রীচৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করতে দু-বাহু বাড়ালেন।

সনাতন মিনতি করলেন, প্রভু, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার স্পর্শের আমি অযোগ্য। আমি নীচ, আমি অধম। আমার গায়ে ভীষণ ক্ষত।

শ্রীচৈতন্য সে নিষেধ শুনলেন না।

ধরলেন। তাঁর গায়ের ক্ষতরস শ্রীচৈতন্যের সর্বশরীরে লেগে গেল।

রোজই এমনি হতো। এতে সনাতনের বড়ই অনুতাপ হতে লাগলো। তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। শেষে একদিন কষ্ট সইতে না পেরে সনাতন ঠিক করলেন, রথচক্রের তলায় শুয়ে অচিরে দেহত্যাগ করবেন।

শ্রীচৈতন্য তা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, দেখ হরিদাস, সনাতন কি গুরুতর অন্যায় করছেন। তিনি আমাকে তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন। এখন সেই দেহ তিনি বিনাশ করতে চান। তাঁর দেহ আমারই নিজধন। তাতে তাঁর কি অধিকার? আমি আমার বস্তু দ্বারা বৃন্দাবনে অনেক কাজ করাবো। এই বলে শ্রীচৈতন্য চলে গেলেন।

তখন

'সনাতনে হরিদাস কহে করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥
তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন॥' (চৈ. চ.)

শ্রীপাদ সনাতন, আপনার ভাগ্যের কি সীমা আছে? প্রভু আপনার দেহ তাঁর নিজধন বলে মনে করেন। সত্যিই, আপনার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই।

কিন্তু আমি হতভাগ্য, শ্রীপাদ। আমার এই পাপদেহ প্রভুর কোন কাজে লাগলো না। মহাপবিত্র এই ভারত-ভূমিতে জন্মে আমার দেহ বৃথায়ই গেল। আমার জীবন ব্যর্থ হলো।

'আমার এই দেহ প্রভুর কার্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥' (চৈ. চ.)

'হরিদাস সনাতনকে অনেক করে বুঝালেন। সনাতন শান্ত হলেন। ` কয়েক দিনের মধ্যেই সনাতনের দেহ নীরোগ হয়ে গেল। হরিদাসের ব্যবহারে, পাণ্ডিত্যে, সাধনায় সনাতন মুগ্ধ হলেন।

'সনাতন কহে, তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান॥
অবতার কার্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার প্রচার নামে করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥' (চৈ. চ.)

এই বলে সনাতন শ্রীহরিদাসের চরণে প্রণত হলেন।

বছরখানেক নীলাচলে থেকে সনাতন বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

———

॥ দশ ॥

যে কোনও ভক্ত নীলাচলে আসেন, তাঁদের সকলেরই হরিদাসকে দর্শন করা চাই। সকলেই হরিদাসের গুণে মুগ্ধ। সকলেই তাঁর সঙ্গ করেন। বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ হরিদাসকে ঘিরে নৃত্য করেন। প্রতি বৎসর শ্রীঅদ্বৈত নীলাচলে এসে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দেখা দিয়ে যান। হরিদাসের প্রিয় পাত্র রাজসন্ন্যাসী শ্রীরঘুনাথ অগাধ ঐশ্বর্য, রূপবতী স্ত্রী পরিত্যাগ করে নীলাচলে এসে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

হরিদাসের বয়স এখন ছিয়াত্তর পার হয়ে গিয়েছে। শরীর তাঁর অবসন্ন। আগের মতো তিনি আর নিয়ম পালন করতে পারেন না। মন তাঁর তাই বিষণ্ণ।

ক্রমে এলো ১৪৪৭ শকের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ।

আগের দিন গিয়েছে একাদশী।

প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছেন। তিনি এসে দেখলেন, হরিদাস শুয়ে শুয়েই অতি ধীরে ধীরে নাম-জপ করছেন।

গোবিন্দ তাঁকে উঠে আহার করতে অনুরোধ করলেন।

হরিদাস বললেন, আমি লঙ্ঘন করবো।

মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করতে নেই। তাই দুটি অন্ন মুখে দিলেন মাত্র।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে এ সংবাদ দিলেন।

পরদিন যথারীতি শ্রীচৈতন্য এলেন। হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুস্থ হও, হরিদাস?

হরিদাস বললেন, প্রভু, আমার শরীর অসুস্থ নয়, অসুস্থ আমার মন। এখন আর সংখ্যা-কীর্তন পূর্ণ করতে পারিনে।

শ্রীচৈতন্য বললেন, হরিদাস, তুমি এখন বৃদ্ধ হয়েছো। চিরদিন কি সকলের সমান শক্তি-সামর্থ্য থাকে? এখন সংখ্যা কমাও। তাতে তোমার অপরাধ হবে না।

'লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥' (চৈ. চ.)

প্রবোধ মানলো না হরিদাসের মন।

তিনি বললেন, প্রভু আমি অতি হীন জাতি, হীন কর্মে রত। অধম, পামর আমি। তুমি আমাকে নরক হতে স্বর্গে তুলেছো। আমার কিছুই বলবার নেই। তবে একটি বাসনা আছে। তাই নিবেদন করি, প্রভু।

'এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে ॥
সে লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥

জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্যনাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥' (চৈ. চ.)

প্রভু, আশঙ্কা করি, শীঘ্রই তুমি লীলা সংবরণ করে অপ্রকট হবে। আমার প্রার্থনা এই, আমাকে কখনো যেন তা দেখতে না হয়। আমি যেন তোমার আগে চলে যেতে পারি। যেন আমি কানে হরিনাম শুনতে শুনতে, মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে বলতে, তোমার চাঁদবদন দেখতে দেখতে, তোমার সামনেই এই পাপদেহ ত্যাগ করতে পারি। আমার সময় হয়েছে। তুমি আমাকে এই আশীর্বাদ করো, প্রভু।

শ্রীচৈতন্য বললেন, হরিদাস, তুমি পরম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়। তোমার বাসনা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। কিন্তু আমার কি উপায় হবে, হরিদাস?

'আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥' (চৈ. চ.)

বলতে বলতে প্রভুর আঁখি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

হরিদাস নিবেদন করলেন, প্রভু, আমি ক্ষুদ্র কীট মাত্র। আমি মরলে পৃথিবীর কী ক্ষতি হবে? বরং পৃথিবীর এক ভার কমবে।

'চন্দ্র সূর্যসম কত মহা মহাজন।
আলোকিত করি তোমা আছে অনুক্ষণ ॥

আমি মৈলে পৃথিবীর এক ভার যাবে।
এ মিনতি মোরে আর বাধা নাহি দিবে॥' (চৈ. চ.)

তিনি প্রার্থনা জানালেন, কাল প্রাতে শ্রীমন্দির দর্শন করবার পর আমাকে দেখা দিতে ভুলো না, প্রভু।

তিনি মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বলে দিলেন, প্রভু, কাল তুমি আসিও।

হরিদাসের মনের কথা বুঝতে পেরে শ্রীচৈতন্য প্রস্তুত হয়েই এলেন। সঙ্গে এলেন প্রধান প্রধান ভক্তগণ, খোল করতাল নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে। এসেই

'প্রভু কহে, হরিদাস কহ সমাচার॥
হরিদাস কহে, প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার॥' (চৈ. চ.)

এই বলে হরিদাস আসন থেকে নিজে নিজে নেমে এসে উঠানে প্রণত হয়ে পড়লেন।

নাম-কীর্তন আবার আরম্ভ হলো। স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর, রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি বড় বড় ভক্ত সকলই এসেছেন। হরিদাসকে ঘিরে চলতে লাগলো সংকীর্তন। মহাপ্রভু নিজেই গাইছেন। আবার কীর্তন থামিয়ে মাঝে মাঝে হরিদাসের গুণ ব্যাখ্যা করছেন। মহাপ্রভু

'হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শতমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥' (চৈ. চ.)

সে গুণ-কীর্তন শুনতে শুনতে ভক্তরা হরিদাসের চরণ বন্দনা করলেন।

তারপর

'হরিদাস মনে নিজ নির্বাণ জানিয়া।
সংকীর্তন মাঝে আসি পড়িল শুতিয়া॥' (চৈ.চ.)

তিনি প্রভু শ্রীচৈতন্যকে হাতে ধরে সামনে বসিয়ে নয়নানন্দনন্দন ভুবনমোহন সেই রূপ দেখতে লাগলেন। আর, অতি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে স্বচ্ছন্দ নামের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন।

'নামের সহিত প্রাণ করিলেন উৎক্রামন।
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দ মরণ॥' (চৈ.চ.)

ভক্তগণ দেখলেন হরিদাসের দেহত্যাগ হয়েছে।

সকলে 'হরি হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

সকলেই অপূর্ব এই ইচ্ছামৃত্যু দেখে আনন্দে কোলাহল করতে লাগলেন।

কুটীর-প্রাঙ্গণ তীর্থস্থান হয়ে গেল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নির্বাক!

তাঁর মুখে কথাটি নেই। তিনি কাউকে কিছু না বলে হরিদাসের দেবদেহ নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন। সতীহারা হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে যেমন উন্মত্তের মতো 'রে সতি! রে সতি!' বলে ক্রন্দন করেছিলেন, এও যেন ঠিক তেমনিই অবস্থা!

দেখাদেখি ভক্তরাও নৃত্য শুরু করলেন।

অনেক পরে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে নিরস্ত করে হরিদাসের দেহ মহাপ্রভুর স্কন্ধ হতে নামালেন। পরে একখানি গাড়ি এনে তার উপরে হরিদাসের দেহ উঠিয়ে গাড়িখানিকে সকলে টেনে নিয়ে সমুদ্রে চললেন। সব আগে মহাপ্রভু নিজে। সব পিছনে বক্রেশ্বর। মাঝে ভক্তরা।

হরিদাসের দেহ সমুদ্রে স্নান করিয়ে তাঁকে নতুন কাপড় পরানো হলো। সকল দেহ তাঁর চন্দনে চর্চিত করে দেওয়া হলো।

'প্রভু কহে, সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল।'

তার পরে ভক্তগণ সমুদ্র-সৈকতে বালির মধ্যে একটি গর্ত খুঁড়লেন। পরে, সকলে হরিদাসের পাদোদক পান করে সেই গর্তের মধ্যে পুণ্যদেহ শুইয়ে দিলেন।

মহাপ্রভু সব আগে শবের উপরে বালুকা দিলেন। পরে এক একজন করে সকলেই বালুকা চাপালেন। শেষে ওখানে এক বেদী তৈরী হলো।

যেখানে এই সমাধি হলো, পুরীধামের সেই অংশের নাম স্বর্গদ্বার।

হরিদাসের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর কাজ শেষ হয়নি।

তিনি নিজে শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়ে দোকানী-পশারীদের কাছে নিজের বস্ত্র পেতে হরিদাসের মহোৎসবের জন্যে ভিক্ষা শুরু করলেন।

'হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥' (চৈ. চ.)

স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তরা তাঁকে নিবৃত্ত করে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

ভক্তরা ভারে ভারে বহু জিনিস ভিক্ষা করে নিয়ে এলেন। এ-সব দিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করা হলো।

জগন্নাথ মন্দিরের অধ্যক্ষ কাশীমিশ্রের বাড়ীতে সেদিন মহাপ্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ছিল। মহাপ্রভু সেখানে গেলেন না। মিশ্র মহাশয় রাশি-রাশি খাদ্য পাঠিয়ে দিলেন।

এমনি করে নানা জাতীয় খাদ্যসম্ভার দিয়ে মহাপ্রভু নিজে থেকে ভক্তগণকে নিজে পরিবেশন করে প্রচুর ভোজন করালেন।

'মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥' (চৈ. চ.)

আহার শেষ হলে মহাপ্রভু বললেন

'হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যে তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন ॥
যে তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যে-বা করিল ভোজন ॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি ॥' (চৈ. চ.)

মহাপ্রভু বিলাপ করতে লাগলেন

'কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥

হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
'তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥' (চৈ. চ.)

হরিদাসের অন্তর্ধানে মহাপ্রভু একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবর্ণনীয় প্রেমোন্মাদ তীব্রতর বেগ ধারণ করলো।

মহাপ্রভুর অতি করুণ বিলাপ এবং হরিদাসের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দেখানোর জন্যে অনুধ্যান মহাপ্রভুর জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কাউকে হারিয়ে মহাপ্রভু কখনও এমন আত্মবিহ্বল হননি। হরিদাসকে হারিয়ে মহাপ্রভুর অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ হয়ে গেল। সকল ভক্তই বুঝতে পারলেন, মহাপ্রভুকে এরপরে আর খুব বেশী দিন পৃথিবীতে ধরে রাখা যাবে না।

বস্তুত হরিদাসের তিরোধানের পর মাত্র সাত বছরের কিছু বেশীকাল মহাপ্রভু ধরাধামে ছিলেন।

হরিদাসের তিরোধান ১৪৪৭ শকে, ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপ্রভুর তিরোধান ১৪৫৪ শকে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

——

শ্রীহরিদাসের লেখা একটি মাত্র শ্লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর পদ্যাবলীতে সেটি উদ্ধৃত করেছেন।

অলং ত্রিদিববার্তয়া কিমিতি সার্বভৌমশ্রিয়া
বিদূরতরবর্তিনী ভবতু মোক্ষ লক্ষ্মীরপি।
কালিন্দগিরিনন্দিনীতট নিকুঞ্জ পুঞ্জোদরে
মনো হরতু কেবলং নবতমালনীলং নভঃ॥

—আর কিছুই আমি চাই না। নীলমণি সমপ্রভ যমুনাতীরে নিকুঞ্জপুঞ্জস্থ নবতমালনীল নভস্থল আমার চিত্ত হরণ করুক।

শেষ